وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

**কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা**

# মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি মানুষের হৃদয় থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। বরং আলেম সম্প্রদায়ের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। যখন সমাজ আলেমশূন্য হয়ে যাবে, তখন মানুষেরা মূর্খদের নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের নিকট ফতওয়া চাইবে। তারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতওয়া দিবে। এতে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৩)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● নভেম্বর ২০২১

Web : www.al-itisam.com

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة:٦، ربيع الأوّل و ربيع الثّاني ١٤٤٣/ نوفمبر ٢٠٢١م العدد: ١، الجزء: ٦١

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

**Monthly AL-ITISAM**

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi; Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

**প্রচ্ছদ পরিচিতি**

**দারসবাড়ি (বিশ্ববিদ্যালয়) মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সংলগ্ন প্রাচীন গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থান উমারপুর সন্নিকটে সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলে মসজিদটি ৮৮৪হি./১৪৯৭ইং সালে নির্মিত হয়। এর অনতিদূরে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনামলের প্রাচীন দারসবাড়ি (বিশ্ববিদ্যালয়) ৯০৯হি/১৫০৪ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে কুতুবে সিত্তাহর দারস দেওয়া হতো।

## পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

**হিজরী ১৪৪৩ ‖ ঈসায়ী ২০২১ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৮**

| ইংরেজি মাস | আরবী মাস | বার | সাহারী শেষ ও ফজর শুরু | সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ | যোহর | আছর | ইফতার ও মাগরিব শুরু | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ নভেম্বর | ২৫ রবী: আউ: | সোম | ০৪ : ৪৮ | ০৬ : ০৪ | ১১ : ৪২ | ০২ : ৫৫ | ০৫ : ২০ | ০৬ : ৩৬ |
| ০৫ ,, | ২৯ ,, | শুক্র | ০৪ : ৫০ | ০৬ : ০৬ | ১১ : ৪২ | ০২ : ৫৪ | ০৫ : ১৮ | ০৬ : ৩৪ |
| ১০ ,, | ০৪ রাবী: আখের | বুধ | ০৪ : ৫২ | ০৬ : ০৯ | ১১ : ৪২ | ০২ : ৫২ | ০৫ : ১৫ | ০৬ : ৩২ |
| ১৫ ,, | ০৯ ,, | সোম | ০৪ : ৫৫ | ০৬ : ১৩ | ১১ : ৪৩ | ০২ : ৫১ | ০৫ : ১৩ | ০৬ : ৩১ |
| ২০ ,, | ১৪ ,, | শনি | ০৪ : ৫৮ | ০৬ : ১৬ | ১১ : ৪৪ | ০২ : ৫০ | ০৫ : ১২ | ০৬ : ৩০ |
| ২৫ ,, | ১৯ ,, | বৃহস্পতি | ০৫ : ০১ | ০৬ : ২০ | ১১ : ৪৫ | ০২ : ৫০ | ০৫ : ১১ | ০৬ : ৩০ |

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

## জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

### ঢাকা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| গাজীপুর | -২ | -২ | -২ |
| নারায়ণগঞ্জ | -১ | -১ | ০ |
| নরসিংদী | -১ | -১ | -২ |
| কিশোরগঞ্জ | -১ | -১ | -৩ |
| টাঙ্গাইল | +২ | +২ | +১ |
| ফরিদপুর | -৩ | -২ | -৪ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৩ | +৩ |
| মুন্সিগঞ্জ | -১ | -১ | ০ |
| গোপালগঞ্জ | +২ | +২ | +৩ |
| মাদারীপুর | ০ | ০ | +১ |
| মানিকগঞ্জ | +১ | +২ | +১ |
| শরিয়তপুর | ০ | ০ | +১ |

### ময়মনসিংহ বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| ময়মনসিংহ | ০ | +১ | -১ |
| শেরপুর | +২ | +৩ | ০ |
| জামালপুর | +২ | +৩ | +১ |
| নেত্রকোনা | -১ | ০ | -৩ |

### চট্টগ্রাম বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | -৭ | -৭ | -৪ |
| কক্সবাজার | | | |
| খাগড়াছড়ি | -৭ | -৮ | -৫ |
| রাঙ্গামাটি | -৮ | -৯ | -৫ |
| বান্দরবান | -৯ | -৯ | -৫ |
| কুমিল্লা | -৪ | -৪ | -৩ |
| নোয়াখালী | -৪ | -৪ | -২ |
| লক্ষীপুর | +৩ | +৪ | +২ |
| চাঁদপুর | -২ | -২ | -১ |
| ফেনী | -৫ | -৫ | -৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -৩ | -৩ | -৩ |

### সিলেট বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| সিলেট | -৫ | -৫ | -৭ |
| সুনামগঞ্জ | -৩ | -৩ | -৬ |
| মৌলভীবাজার | -৫ | -৫ | -৬ |
| হবিগঞ্জ | -৪ | -৪ | -৫ |

### রাজশাহী বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রাজশাহী | +৭ | +৮ | +৭ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৯ | +৯ | +৮ |
| নাটোর | +৬ | +৬ | +৫ |
| পাবনা | ৪+ | +৫ | +৪ |
| সিরাজগঞ্জ | +৩ | +৪ | +২ |
| বগুড়া | +৫ | +৫ | +৩ |
| নওগাঁ | +৬ | +৭ | +৫ |
| জয়পুরহাট | +৬ | +৭ | +৪ |

### রংপুর বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রংপুর | +৬ | +৬ | +২ |
| দিনাজপুর | +৮ | +৮ | +৫ |
| গাইবান্ধা | +৪ | +৪ | +২ |
| কুড়িগ্রাম | +৪ | +৪ | +১ |
| লালমনিরহাট | +৫ | +৫ | +২ |
| নীলফামারী | +৭ | +৭ | +৪ |
| পঞ্চগড় | +৯ | +৯ | +৫ |
| ঠাকুরগাঁও | +৯ | +৯ | +৬ |

### খুলনা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| খুলনা | +৩ | +২ | +৪ |
| বাগেরহাট | +২ | +১ | +৪ |
| সাতক্ষীরা | +৪ | +৪ | +৬ |
| যশোর | -১ | -১ | -২ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৬ | +৬ | +৬ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৩ | +৫ |
| মেহেরপুর | ০ | ০ | +১ |
| মাগুরা | +৪ | +৪ | +৪ |
| নড়াইল | +৩ | +৩ | +৪ |

### বরিশাল বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| বরিশাল | -১ | -১ | +১ |
| পটুয়াখালী | -১ | -১ | +২ |
| পিরোজপুর | +১ | +১ | +৩ |
| ঝালকাঠি | ০ | ০ | +২ |
| ভোলা | -২ | -২ | ০ |
| বরগুনা | ০ | -১ | +৩ |

৬ষ্ঠ বর্ষ
১ম সংখ্যা
নভেম্বর-২০২১
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮
রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

**প্রধান সম্পাদক**

**আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

**সার্বিক সম্পাদনায়**

**আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ**

**সার্বিক যোগাযোগ**

**মাসিক আল-ইতিছাম**

- **প্রধান সম্পাদক,**
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:০০মি.-৫:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

**আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

**হাদিয়া**

**২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র**

| বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা | ষাণ্মাসিক | বাৎসরিক |
|---|---|---|
| সাধারণ ডাক | ২০০/- | ৪০০/- |
| কুরিয়ার সার্ভিস | ৩০০/- | ৬০০/- |

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দারসে হাদীছ**
  - » কুরআন তেলাওয়াত : সার্বিক কল্যাণ লাভের সর্বোত্তম উপায় ০৩
    *-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*
- **প্রবন্ধ**
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৫) ০৭
    *-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*
  - » আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ০৯
    *-আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী*
  - » সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-৪) ১১
    *-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*
  - » ঘটনাবহুল আফগান শাসনের অতীত ও বর্তমান ১৪
    *-ড. মো. কামরুজ্জামান*
  - » ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ (শেষ পর্ব) ১৮
    *-মূল : প্রফেসর কে এস রামাকৃষ্ণ রাও*
    *অনুবাদ ও পরিমার্জন : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী*
  - » আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৯) ২১
    *-মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর*
    *অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান*
  - » একটি লিফলেটের ইলমী জবাব (পর্ব-৪) ২২
    *-আহমাদুল্লাহ*
  - » রসিকতা হোক পরিমিত ২৪
    *-উছমান ইবনু আব্দুল আলিম*
  - » মুঠোফোন প্রযুক্তি : অপূরণীয় ক্ষতি ২৬
    *-মীযান মুহাম্মাদ হাসান*
- **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
  - » প্রশংসনীয় চরিত্র ২৭
    *-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী*
- **তরুণ প্রতিভা**
  - » সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ২৯
    *-শুয়াইব বিন আহমাদ*
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  - » হঠাৎ কেন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিয়ে এত অস্থিরতা? ৩২
    *-জুয়েল রানা*
- **নারীদের পাতা**
  - » আসল বিজয়ী কে? ৩৪
    *-কাযী ফেরদৌস করীম (মুন্নি)*
- **জামি'আহ পাতা**
  - » ক্বীমাতুয যামান বা সময়ের মূল্য ৩৫
    *-সায়্যিদ তাসনীম আল-আমীন*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
  - » এক দল যুবকের দ্বীনে ফেরার গল্প ৩৮
    *-মো. হামিদুর রহমান (তামিম)*
- **কবিতা** ৪০
- **বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক** ৪১
- **সওয়াল-জওয়াব** ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

## ইসলামে ধর্মীয় উদারতা :

১৩ অক্টোবর ২০২১ রাতে কুমিল্লা সদরের নানুয়ার দীঘিরপাড়ের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজার মণ্ডপে পবিত্র কুরআন অবমাননার ঘটনা ঘটে। যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন হনুমান মূর্তির কোলে কুরআন রেখে কে বা কারা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের চরম অবমাননার অপচেষ্টা করে। ফলে সারাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙচুরসহ হতাহতের ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। ২২টি জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এর সাথে জড়িতদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

এরপর আমরা বলতে চাই- ইসলাম, ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন-হাদীছ ও এর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে অবমাননার অপচেষ্টার ঘটনা নতুন নয়। বরং সর্বযুগে এজাতীয় ঘটনা ঘটেছে। এমনকি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেও তাঁকে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেসব ঘটনার বিপরীতে যুগে যুগে তাদের ভূমিকা কী ছিল, তা আমাদেরকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। শান্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারেনি। এমনকি যুদ্ধেও নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক নিরপরাধ নাগরিকের উপর হামলা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। অনুরূপভাবে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট করাও নিষেধ। সেজন্য মুসলিমদের হৃদয়ে অন্যদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতারণা লুক্কায়িত থাকে না। বরং একজন মুসলিম ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, অঙ্গীকার রক্ষা, দয়ার্দ্রতা ও নিরাপত্তা দ্বারা সকল মানুষের সাথে চলে। তবে এক্ষেত্রে সে ইসলামী আক্বীদা ও আচার-অনুষ্ঠানের অপমান বরদাশত করে না। নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েম করেন, তখন সেখানে বানু কুরায়যা, বানু ক্বায়নুক্বা‘ ও বানুন-নাযীর নামে তিনটি ইয়াহূদী গোত্র ছিল। ইসলাম যদি পরম উদারতা ও সহিষ্ণুতার ধর্ম না হতো, তবে তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সহযোগিতা ও উত্তম প্রতিবেশিত্বের সন্ধি চুক্তি করতেন না। মুসলিমদেশে কাফেরদের প্রতি ইসলাম কী অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করেছে, তা ইসলামের নিম্নবর্ণিত মূলনীতিগুলো থেকে খুব সহজে বুঝা যায় : (১) কাফেররা তাদের কুফরী অবস্থায় থাকতে পারবে। ‘আহলুয-যিম্মাহ’ বা মুসলিমদেশে ট্যাক্স দিয়ে বসবাসকারী কাফের, ‘মু‘আহিদ’ বা চুক্তিবদ্ধ কাফের ও ‘মুসতা’মিন’ বা ভিসা নিয়ে মুসলিমদেশে আগত কোনো কাফেরকে ইসলাম তাদের কুফরী অবস্থায় থাকার অনুমোদন দিয়েছে। তাদের কাউকে ইসলামে প্রবেশের জন্য ইসলাম বাধ্য করে না *(আল-বাক্বারাহ, ২/২৫৬)*। উল্লিখিত কোনো কাফেরের রক্ত ঝরালে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না বলে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে *(বুখারী, হা/৩১৬৬)*। (২) কাফেরদের সাথে চুক্তি করা বৈধ। ইসলাম তাদের এবং আমাদের মধ্যকার এই চুক্তি রক্ষা ওয়াজিব করেছে, যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে *(আত-তওবা, ৯/৪)*। (৩) কাফেরদের সাথে শান্তি চুক্তি করা এবং তাদের নিরাপত্তা গ্রহণ করা বৈধ। খোদ নবী ﷺ কতিপয় কাফেরের নিরাপত্তা ও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, হা/৩১৩৯)*। (৪) কাফেরদের হেদায়াতের আশায় তাদের রক্ত না ঝরানোর প্রতি যত্নশীল হওয়া। নবী ﷺ-এর ভূমিকা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় *(দ্র. মুসলিম, হা/১৭৮০)*। (৫) কোনো মুসলিম কোনো কাফেরকে আশ্রয় দিতে পারে। আর এ অবস্থায় তার জান-মাল নিরাপদ থাকবে *(দ্র. আত-তওবা, ৯/৬; বুখারী, হা/৩১৭৯; মুসলিম, হা/১৩৭১)*। (৬) কাফেরদের প্রতি ইনছাফ করা ওয়াজিব, যদিও তা মুসলিমদের বিপক্ষে হয় *(আল-মায়েদা, ৫/৮; আহমাদ, হা/১৪৯৫৩, সনদ শক্তিশালী)*। (৭) সাধারণ কাফের জনগোষ্ঠীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে *(আল-মুমতাহিনা, ৬০/৮)*। (৮) কাফেরদের দেবতাদের ভাঙচুর তো দূরের কথা, গালি দিতেও মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন, অন্যথা তারাও আল্লাহকে গালি দিবে *(আল-আনআম, ৬/১০৮)*।

এক্ষণে আমাদেরকে যা করতে হবে : (১) উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতিতে আবেগতাড়িত ও অপরিণামদর্শী হয়ে তাড়াহুড়ো করে এমন কোনো কর্মকাণ্ড করা যাবে না, যা হিতে বিপরীত হতে পারে। বরং নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। যেখানে বিনা জ্ঞানে আল্লাহকে গালি দিতে পারে বলে মুশরিকদের গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে আমাদের পদক্ষেপ কত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত হতে হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অযথা নিরপরাধ জনগণ ও তাদের বাড়ি-ঘর, মালামালের উপর হামলা করা যাবে না। (২) নিন্দা ও প্রতিবাদের শরীআতসমর্থিত যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনলাইন-অফলাইন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় আলেম-উলামাকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। (৩) মুসলিমদেরকেই আগে পবিত্র কুরআনের সম্মান দেওয়া শিখতে হবে। আর তা হবে কুরআন শেখা, শেখানো ও সার্বিক জীবনে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে। (৪) অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি ইসলামের উদারতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সকলের নিকট তুলে ধরতে হবে। (৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিফযুল কুরআনের জন্য ও ব্যাপকহারে কুরআন প্রিন্ট ও বিতরণের জন্য ওয়াক্বফ গড়ে তুলতে হবে। (৬) পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, যাতে কুরআন মাজীদের শান্তির বার্তা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়। (৭) একদল গবেষক তৈরি করতে হবে, যারা অবমাননাকারীদের তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক জবাব দিতে পারবেন। (৮) যে কোনো জাতি ও গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা থেকে সতর্ক থাকতে হবে, সেই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ যেমনই হোক না কেন। ববং তাদেরকে দলীল-প্রমাণ ও উত্তম নছীহতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাদের ধর্মের অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। (৯) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে কুরআন অবমাননার বিষয়টিকে তাদের বড় ইস্যুগুলোর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অবমাননাকারীদের ব্যাপারে আইন করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (১০) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের কাছে সকল জাতি ও গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া নিষিদ্ধ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার ও দ্বীন পালনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

# কুরআন তেলাওয়াত : সার্বিক কল্যাণ লাভের সর্বোত্তম উপায়

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

**সরল অনুবাদ :** আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কুরআন অধ্যয়নে পারদর্শী ব্যক্তি মর্যাদাবান লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথী হবে। আর যে কষ্ট করে কুরআন পাঠ করে, সে দু'টি পুরস্কার পাবে— একটি আবৃত্তির জন্য এবং অন্যটি কষ্টের জন্য'।[১]

**ব্যাখ্যা :** মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের বিচারে আল-কুরআন অতুলনীয়। এর চমৎকার ভাষা, অতুলনীয় রচনাশৈলী, অপূর্ব শব্দচয়ন, জাদুকরী ঝংকার, অলৌকিক বাক্যগঠন, মর্মস্পর্শী ভাব, অভাবনীয় সম্মোহনী শক্তি প্রত্যেককে আকৃষ্ট করে। সত্যপথের দিশা, আদর্শ জীবন গঠন, উত্তম চরিত্রসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন হচ্ছে আলোকবর্তিকা ও নির্দেশনাস্বরূপ। আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ বাণী ও উত্তম বর্ণনা হচ্ছে এই আল-কুরআন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ 'নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যারা সৎ কাজ করে সেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(বনী ইসরাইল, ১৭/৯)*।

শরীআতের প্রধান ও মৌলিক উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। শারঈ হুকুম-আহকাম এবং ইসলামের মৌলিক আইন-কানুনের বর্ণনা এতে রয়েছে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য, সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো কুরআনের তেলাওয়াত, অধ্যয়ন, গবেষণা ও সে অনুযায়ী আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'তারাই ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তরের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*।

জীবনের যেকোনো সমস্যার সমাধান বা বিপদ থেকে মুক্তি বা উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় কুরআন হলো প্রধান উৎস। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (হে ঈমানদারগণ!) যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকাল দিবসকে বিশ্বাস করে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম উপায়' *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। অর্থাৎ কুরআনের বিধান অথবা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের দিকে ফিরে আসো। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতি এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নাতের প্রতি ফিরে আসতে হবে। আল-কুরআন অভ্রান্ত সত্যের উৎস। এটি ফেরেশতা জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে সরাসরি শেষ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাইতো এটি অদ্যাবধি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এখানে মিথ্যার অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ 'বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত (সত্তার) পক্ষ থেকে নাযিলকৃত' *(ফুছছিলাত, ৪১/৪২)*। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে কুরআন তেলাওয়াত এবং তদনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উক্ত হাদীছ আমাদেরকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তেলাওয়াতের নিম্নের তিন প্রকার উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করে-

**প্রথম উপকারিতা :** কুরআন তেলাওয়াত ও মুখস্থ করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়, যদিও এটি একজন মুসলিমের জন্য কষ্টকর হয়। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মানুষ যিনি কুরআন তেলাওয়াত শিখেন ও মুখস্থ করার চেষ্টা করেন। তিনি সাধনা করতে থাকেন এমনকি এটি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। তার উচ্চারণ অত্যন্ত চমৎকার এবং মুখস্থ খুব মযবূত হয়। তিনি ঐ সব ফেরেশতার সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পাবেন, যাদের ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ - مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ - بِأَيْدِي سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ - 'এটা সংরক্ষিত আছে সম্মানিত ছহীফায়, উন্নত ও পবিত্র ফেরেশতাদের হাতে যারা মহৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ' *(আবাসা, ৮০/১৩-১৬)*। সুতরাং যিনি দক্ষতার সাথে কুরআন পাঠ করবেন, তিনি ফেরেশতাদের

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৮; মিশকাত, হা/২১১২।

সাথে থাকার সুযোগ পাবেন। কারণ আল্লাহ তার জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন, যেমন তিনি মহৎ, ধার্মিক ফেরেশতাদের জন্য সহজ করেছিলেন। তেলাওয়াতের এই স্তর পূর্ণাঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ।[২] এই স্তরের পাঠক হওয়ার সক্ষমতা অর্জনের সাধনা করা প্রত্যেকের উচিত। এই স্তরের পাঠকগণ যদি কুরআনের বাহ্যিক নির্দেশনা এবং অভ্যন্তরীণ দাবির আলোকে জীবন গড়ে তোলেন, তবে তারা কিয়ামতের দিন সৎকর্মশীল সম্মানিত ফেরেশতার সাথে অবস্থানের সুযোগ পাবেন।

দ্বিতীয় স্তরের পাঠক তিনি, যিনি খুব কষ্ট করে কুরআন তেলাওয়াত করেন, উচ্চারণ করতে গিয়ে বারবার আটকে যান, তবুও তেলাওয়াত করতে থাকেন। কুরআনের ইলাহী জ্ঞান আহরণ, এতে নিহিত কল্যাণের অন্বেষণ এবং এর বিধানের আলোকে জীবনযাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার চেষ্টা অব্যাহত থাকে, এ জাতীয় পাঠকের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটা হচ্ছে কুরআন পাঠের প্রতিদান, আরেকটি হচ্ছে কষ্টসাধ্য হওয়ার প্রতিদান।

এটিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মানুষের জন্য একটি বড় অনুগ্রহ। সুতরাং প্রত্যেকের কুরআনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং কুরআনের যা মুখস্থ করা তার জন্য সহজ হয় তা মুখস্থ করা। তাই কুরআনের অর্থ জেনে সে অনুযায়ী আমল করার প্রাণপণ চেষ্টা করাই প্রত্যেকের একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে।

**দ্বিতীয় উপকারিতা :** পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় আল্লাহ তাআলার বাণী পাঠ করে সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যা কুরআন পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে। রাত-দিন সর্বদা কুরআন তেলাওয়াতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। আল্লাহর বাণীর অর্থ জানার জন্য আমাদের জেগে উঠতে হবে। তাঁর বাণী নিয়ে গবেষণা এবং তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ‘তারা কি কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করে না, না-কি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ?’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

এক্ষেত্রে হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ কুরআনকে রবের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাঁর বাণী নিয়ে রাতে গবেষণা করতেন এবং দিনে এর তাৎপর্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন।[৩] ইবনুল ক্বাইয়িম কাঙ্ক্ষিত তেলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, গবেষণার সাথে তেলাওয়াত করা, অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাধনা করা কুরআনের ঐ গবেষকের সমতুল্য যে কুরআনকে মুখস্থ করে এবং এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যাতে করে সে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।[৪]

কিছু আলেম এ জাতীয় গবেষককে কুরআনের ঐ দক্ষ পাঠকের তালিকাভুক্ত করেছেন, যাদের বৈশিষ্ট্যের কথা এই হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী ‘আত-তিযকার ফী আফযালিল আযকার’ নামক গ্রন্থে বলেছেন, যতক্ষণ না একজন মানুষ কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবে, ততক্ষণ সে কুরআনের মাহের তথা দক্ষ পণ্ডিত হবে না। এভাবে যে সে কুরআনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, অতঃপর সে আল্লাহর নিকটে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবে এবং তার ওপর যে ফরয কর্তব্য রয়েছে, তা বুঝে আমল করার চেষ্টা করবে।[৫]

**তৃতীয় উপকারিতা :** প্রত্যেক মুসলিমের কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এর বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করা অপরিহার্য। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সহযোগিতা এবং কুরআনে কারীমের আয়াত মনোযোগ সহকারে বারবার শোনার মাধ্যমে বর্তমানে এটি আরও সহজ হয়েছে। কুরআনের জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণার জন্য যদি একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করা হয়, তবে কুরআন শেখার গুরুত্বের বিবেচনায় এটা তেমন একটা দীর্ঘ সময় নয়। এমন মনোযোগ দিতে হবে এবং বারবার তেলাওয়াত করতে হবে যেন পঠনে দৃঢ়তা এসে যায়। তেলাওয়াতে দৃঢ়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়তে হবে; যদিও একটি পৃষ্ঠা পাঠে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করার প্রয়োজন পড়ে। এমনকি প্রয়োজন হলে কয়েক দিন অতিবাহিত করতেও পিছপা হওয়া যাবে না।

২. কাযী ইয়াযের, ইকমালুল মুআল্লিম বিফাওয়াইদা মুসলিম, ৩/১৬৭।

৩. তিবয়্যান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃ. ২৮।

৪. মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৭।

৫. আততিযকার ফি আফযালিল আযকার, পৃ. ৭৯।



www.al-itisam.com

উছমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে আল-কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়'।[৬] মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সূরা আল-বাক্বারা মুখস্থ করার জন্য আট বছর সময় ব্যয় করেছিলেন।[৭] বাজি (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন, মুখস্থ করতে দেরি হওয়ার কারণে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়নি। এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এই কারণে যে, যাতে তিনি এর ফরয বিধান এবং হুকুম-আহকামগুলো ভালো করে জেনে নিতে পারেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।[৮] আল্লামা ইমাম বায়হাক্বী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি সূরা আল-বাক্বারা ১২ বছর পড়েছেন। তারপর যখন পড়া শেষ করেছিলেন, তখন একটি উট কুরবানী করেছিলেন।[৯]

দক্ষতার সাথে তেলাওয়াত করা কিংবা সাধারণভাবে তেলাওয়াত করা অথবা তেলাওয়াত করা বা না করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআনের পাঠকের মর্যাদাগত অবস্থান রয়েছে। কিন্তু যিনি কুরআন তেলাওয়াত করেন, তাঁর হৃদয় যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তিনি যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন ও জীবনযাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি তিনি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেন, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি কুরআনের প্রকৃত অর্থ বুঝেছেন, সে অনুযায়ী আমল করেছেন। এই শ্রেণির পাঠকের বিশাল মর্যাদা রয়েছে। কারণ তিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেন এবং তিনি তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। তাইতো তাকে তুলনা করা হয়েছে কমলালেবুর সাথে, যা খেতে সুস্বাদু এবং যার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

আর যদি তার আচার-আচরণ ভালো হয়, যদি তিনি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি কুরআন তেলাওয়াত করেন না। তিনি মানুষের নিকট প্রশংসিত হবেন, মানুষ তাকে ভালো হিসেবে জানবে, কিন্তু তার সুনাম-সুখ্যাতি ঐভাবে ছড়িয়ে যাবে না। তাকে তুলনা করা হয়েছে খেজুরের সাথে, যার গন্ধ নেই, কিন্তু তা পুষ্টিকর, সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও উপকারী। তবে তার কোনো সুগন্ধ থাকে না। কেননা তিনি মানুষকে কুরআনের জ্ঞান শেখাতে পারেন না।[১১]

আর যে মুনাফিক্ব কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত করে, সে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম ও অন্যায় কজে জড়িত। কারণ তার হৃদয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। তাকে তুলনা করা হয়েছে তুলসী গাছের সাথে, যার গন্ধ আছে তবে স্বাদ তিতো। তেলাওয়াতের কারণে তার সুগন্ধ ছড়ায় আর সে কুরআনের যা শ্রবণ করে তাও পবিত্র। তবে তার হৃদয় অপবিত্র। তার থেকে কুরআনের যে সুগন্ধি ছড়ায় তা পবিত্র। কেননা কুরআন পবিত্র ছাড়া কিছুই ছড়ায় না।[১২]

আর যে মুনাফিক্ব কুরআন তেলাওয়াত করে না, মাকাল ফলের মতো অপবিত্র; যার স্বাদ তিক্ত আর কোনো গন্ধ নেই।[১৩]

আল-কুরআনের তেলাওয়াত পাঠকের জন্য এক মহামূল্যবান নিয়ামত। পাঠকের হৃদয়, মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাকে বিকশিত করে কল্যাণের পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, তার মনোজগতের বিকাশ, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন এবং তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কুরআনের তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন একজন মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। আলোকিত ও কল্যাণকর জীবন লাভ ও নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কুরআনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই জন্য কুরআন তেলাওয়াতের চর্চা এবং কুরআনের আলোকে আমলের মাধ্যমে নিজেকে সম্মানিত করা ও সমাজে নিজেকে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রত্যেক মুমিনের কুরআনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। জ্ঞান, কর্ম, পথপ্রদর্শন ও মানুষের উপকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার উপর কুরআনের প্রভাব প্রকাশ পাবে। এমনকি তার মধ্যে হাদীছের দৃষ্টান্তটি বাস্তবায়িত হবে। আর তা হচ্ছে সে

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।
৭. মুয়াত্ত্বা মালেক, ২৮৭/২, হা/৬৯৫।
৮. আল্লামা বাজী, আন-তানবিরীল হাওয়ালিক, ১/১৬২।
৯. শুআবুল ঈমান, ৩/৩৪৬, হা/১৮০৫।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৭।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৭।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৭।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪২৭।

কমলালেবু ও খেজুরের মতো হবে। যখনই তার কুরআনের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, তখনই মানুষকে তার শরীআত সম্পর্কে শিক্ষাদান বৃদ্ধি পাবে আর তার প্রতিদান ও সম্মানও বেড়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের নির্দেশনা দেবে, সে আমলকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে’।[১৪]

মানুষের মান-সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছুই আল-কুরআনের আমলের উপর নির্ভর করে। মানুষ যদি নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে আন্তরিকতার সাথে যত্ন সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করে তবে সে মর্যাদার শীর্ষস্থানে অবস্থান করবে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে না অথবা এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهذا الكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ به آخَرِينَ ‘এই কিতাবের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়কে সম্মানিত করবেন এবং অপর একটি সম্প্রদায়কে অপমানিত করবেন’।[১৫] ‘এই কিতাবের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়কে সম্মানিত করবেন’ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা এর আলোকে আমল করবে এবং এর বিধান মেনে জীবনযাপন করবে, তারা মর্যাদার শীর্ষস্থানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের এই কুরআনের দ্বারা সম্মানিত করবেন এবং তারা যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে গণ্য হবেন। আর তাঁর বাণী, ‘এই কিতাবের মাধ্যমে অপর একটি সম্প্রদায়কে অপমানিত করবেন’ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা এই কুরআনকে অবমূল্যায়ন করবে এবং এর শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের কোনো সম্মান থাকবে না। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করেনি।

কোনো মুমিনের জন্যই শোভনীয় নয় যে, সে কোনো বিষয়ে কারও প্রতি ঈর্ষা করবে। তবে দুইটি বিষয় : একটি কুরআনের জ্ঞান অর্জন, অপরটি আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ﴿لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ‘দু’টি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তাআলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তেলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান করতে থাকেন’।[১৬]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একজন মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করবেন। তিনি আল্লাহর নিকট বিশাল মর্যাদা ও সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন। কারণ তিনি কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে একজন মুমিন কুরআন তেলাওয়াত, কুআনের জ্ঞান অর্জন ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে অন্য মুমিনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হবেন। তিনি চেষ্টা করবেন যে, কুরআন তেলাওয়াত ও দানের ক্ষেত্রে তিনি যেন তার চেয়ে ভালো বা উত্তম হতে পারেন।

সুতরাং উক্ত হাদীছের আলোকে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। আমাদের সন্তানসন্ততিকে আল-কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাদের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে কুরআন অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ইহকাল ও পরকালকে স্বার্থক ও অর্থবহ করতে হলে কুরআনের বিধানকে সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যদি কুরআনের শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে প্রকৃত অর্থে আমরা দুনিয়া এবং পরকালে সার্থক, সফল ও সম্মানিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। আল্লাহ আমাদের সাবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! ছুম্মা আমীন!!

১৪. আদাবুল মুফরাদ, হা/১৮১।

১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১৭।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৫।



www.al-itisam.com

# হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৫)

**রমল :** ধীর পদে বীর বেশে দ্রুত চলার নাম রমল। রমল শুধু ত্বাওয়াফে কুদূমে এবং প্রথম তিন চক্করে করতে হবে।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ

সালেম রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি মক্কায় এসে কালো পাথরে চুম্বন দিলেন। আর সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন।[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে নিয়ে মক্কায় আসলেন। তখন মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক তোমাদের কাছে আসছে, যাদের ইয়াসরিব (মদীনার) এর জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে। (একথা শুনে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে ত্বাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে আদেশ করলেন আর উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলতে আদেশ করলেন। ছাহাবীগণের প্রতি দয়া করে সব চক্করে রমল করতে আদেশ করলেন না।[২] এই হাদীছে বুঝা যায়, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন রমল করার আদেশ করেছিলেন। পরবর্তীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের নিয়ে বিদায় হজ্জে আসলেন এবং রমল করলেন যার কারণে রমলের বিধান বলবৎ রয়েছে। নারী-পুরুষ সকলকেই সাত চক্কর ত্বাওয়াফ করতে হবে। ত্বাওয়াফের গণনায় সন্দেহ হলে যে সংখ্যা দৃঢ় মনে হবে, সে অনুযায়ী বাকী চক্কর পূর্ণ করতে হবে। ত্বাওয়াফ চলাকালে ছালাত শুরু হলে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাবে। ছালাত শেষে যেখান থেকে ছেড়েছে, সেখান থেকে আরম্ভ করবে।

**ত্বাওয়াফের দুই রাকআত ছালাত :** ত্বাওয়াফ শেষ করে সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে। প্রথম রাকআতে কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পড়বে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাক্বামে ইবরাহীম পৌঁছলেন, তখন এ আয়াতটি পড়লেন, ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ তারপর তিনি দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেন। তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন, তারপর সূরা কাফেরূন পড়লেন। তারপরের রাকআতে সূরা ইখলাছ পড়লেন।[৩] মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সম্ভব না হলে যে কোনো স্থানে পড়বে।

**মুলতাযাম :** হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মাঝের অংশ মুলতাযাম। এখানে বুক, মুখ ও দুই হাত রেখে দু'আ করা যায়।

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ أَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ

আমর ইবনু শুআইব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের সাথে ত্বাওয়াফ করলাম। তিনি যখন ত্বাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করলেন, তখন কা'বার পিছনে দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাইবেন না? তিনি বললেন, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ 'আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই'। তারপর তিনি কালো পাথরে চুম্বন দিলেন, তারপর কালো পাথর ও দরজার মাঝে দাঁড়ালেন, তারপর বুক, দুই হাত এবং গাল লাগালেন। তারপর তিনি বললেন, আমি এভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে করতে দেখেছি।[৪]

كَانَ يَضَعُ صَدْرَهُ ووَجْهَهُ وذِرَاعَيْهِ وكَفَّيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ والْبَابِ. يَعْنِي فِي الطَّوَافِ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুক, চেহারা, দুই বাহু এবং দুই হাত হাজরে আসওয়াদ এবং দরজার মাঝে লাগাতেন।[৫]

**যা করা যাবে না :**

(১) হাজরে আসওয়াদ কোনো ক্ষতি বা কোনো উপকার করতে পারে- এ ধারণা রাখা যাবে না।

(২) হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়ার জন্য হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি করা যাবে না।

(৩) হাজরে আসওয়াদে ইশারা করা যাবে তবে হাতে চুম্বন দেওয়া যাবে না এবং চেহারা মুছা যাবে না।

(৪) ত্বাওয়াফের প্রতি চক্করে বিশেষ দু'আ বলা যাবে না।

(৫) রমলে বা হাজরে আসওয়াদে বিশেষ কোনো দু'আ নেই।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৬০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৬১।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৬০২।
৩. নাসাঈ, হা/২৯৬৩; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৬০৭০, হাদীছ ছহীহ।
৪. ইবনু মাজাহ, হা/২৯৬২, হাদীছ হাসান।
৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/২১৩৮, হাদীছ ছহীহ।



www.al-itisam.com

(৬) কা'বাঘরের ছাদে পানি পড়ার স্থানে দু'আ করা যাবে না।

(৭) কা'বার গেলাফে এবং দেওয়ালে চুমু খাওয়া যাবে না। কা'বাঘর হাত মুছে চেহারা ও বুকে মালিশ করা যাবে না। কা'বার গেলাফ ধরে কান্নাকাটি এবং শরীরে মালিশ করা যাবে না।

(৮) ত্বাওয়াফে সমস্বরে যিকির বা দু'আ করা যাবে না এবং উচ্চকণ্ঠে কান্না করা ও দু'আ-দরূদ পড়া যাবে না।

(৯) ত্বাওয়াফের সাত চক্করেই রমল করা যাবে না।

(১০) হাজরে আসওয়াদে না পৌঁছেই ত্বাওয়াফ শুরু করা যাবে না।

(১১) ত্বাওয়াফ শেষে দুই রাকআতের বেশি ছালাত আদায় করা যাবে না এবং দলবদ্ধভাবে দু'আ করা যাবে না।

**যমযমের পানি পান :** ত্বাওয়াফের ছালাত শেষ করে যমযমের পানি পান করা উত্তম এবং মাথায় পানি দিতে পারে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ فِي الْأَدَاوِىْ وَ الْقِرَبِ وَ كَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَ يَسْقِيْهِمْ 'নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মশকের এবং পাত্রে যমযমের পানি বহন করতেন। অসুস্থ ব্যক্তির মাথায় পানি ঢালতেন এবং তাদের পান করাতেন'।[৬]

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। যমযমের পানি যে নিয়তে পান করবে, তাই হবে।[৭]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءِ زَمْزَمَ ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَ شِفَاءٌ مِنَ السَّقَمِ 'মাটির উপর সবচেয়ে উত্তম পানি হলো যমযমের পানি। এটা এক প্রকার খাদ্য এবং রোগের আরোগ্য'।[৮] আবূ যার গেফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যমযম বরকতময় পানি। এটা ক্ষুধার্তের খাদ্য এবং রোগের নিরাময়।[৯]

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য বালতিতে করে যমযমের পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন।[১০]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) যমযমের পানি বহন করতেন এবং বলতেন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যমযমের পানি বহন করতেন।[১১]

উক্ত হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা পূর্ণ হবে। যমযমের পানি রোগ নিরাময়ের ওষুধ। যমযমের পানি মূলত ইসমাঈল এবং তার মা হাজেরাকে আল্লাহ দান করেন। তারপর আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহে এ পানি আজ পর্যন্ত চালু আছে।

*(চলবে)*

৬. সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩, হাদীছ হাসান।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/৩০৬২, হাদীছ ছহীহ।
৮. সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৫৬, হাদীছ হাসান।
৯. সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৫৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৭; মিশকাত, হা/৪২৬৭।
১১. তিরমিযী, হা/৯৬৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩, হাদীছ ছহীহ।

AT TAQWA STORE
01575245872 @attaqwastore
بسم الله الرحمن الرحيم
খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্যের প্রচেষ্টায়। ইন শা আল্লাহ, আমাদের কাছে পাবেন,
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ৬৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- সুন্দরবনের খলিশা মধু - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালিজিরা মধু (ধনিয়া মিক্স) - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু ফুলের মধু - ২৭৫ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু কালোজিরা মিশ্র মধু - ৩২০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কাঠের ঘানিতে ভাঙ্গা সরিষার তেল (কোল্ড প্রেসড) - দাম জানতে কল করুন,
- সরিষার তেল (মেশিনে ভাঙ্গানো) - দাম জানতে কল করুন,
- খেজুরের গুড় (সিজনাল),
- আম (সিজনাল),
- নির্ভরযোগ্য লেখকদের ইসলামিক বই।
ফ্রি ডেলিভারি চার্জ
অর্ডার করতে কল করুন ০১৩২১৪৪৭৫৭৫, হোয়াটসঅ্যাপ ০১৫৭৫২৪৫৮৭২, ফেইসবুকে সার্চ করুন @attaqwastore
ডাঙ্গিপারা (আল জামিয়া আস-সালাফিয়্যাহ সংলগ্ন), পবা, রাজশাহী।

# আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা ওয়াজিব

-আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**(খ) আল্লাহ আকারবিশিষ্ট বা সাকার :**

**আল্লাহর আকারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি নিরসন :** এটা অবশ্যই সঠিক কথা যে আল্লাহ কেমন এ প্রশ্নের জবাবে ‘নিরাকার’ বলা কুফরী হলেও আকারবিশিষ্ট বা সাকার বলা ভুল নয়। আল্লাহর আকারের ক্ষেত্রে তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি/আক্বীদা লক্ষ্য করা যায়: (১) দেহবাদী (২) সংশয়বাদী (৩) ছহীহ আক্বীদা।

**(১) সাকার/দেহবাদী :** তারা হিন্দু-বৌদ্ধদের মতোই মূর্তিপূজক। তারা মুর্দা মানুষ বা মাখলূকের মূর্তিপূজা করে। আর দেহবাদীরা চিরঞ্জীব আল্লাহর মূর্তি নির্ধারণ করে পূজা করে। কারণ, তাদের আল্লাহ না কি দাড়ি-গোঁফ গজানোর উপক্রম নওজোয়ান এর মতো। অনেক সূফীবাদীদের আক্বীদা বিশ্বাস এরূপ দেখা যায়। বাংলাদেশের দেওয়ানবাগী পীর ও আযহারউদ্দীন ছিদ্দীক্বী তথা মানিকগঞ্জের পীর ও তাদের মুরীদদের আক্বীদা এরূপ। দেওয়ানবাগী বলেছে, আরশে মুআল্লায় গেলে দেখা যাবে দেওয়ানবাগীই সেখানে বসে আছে- নাঊযুবিল্লাহ। এসব কথা লিখতে, বলতে ও পড়তে অন্তর কাঁপছে। কিন্তু তাদের কোনো ভয়-ভীতি নেই। কত বাতিল ও নির্লজ্জ হলে এমন কথা বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে। আক্বীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অস্পষ্ট ধারণাসম্পন্ন কিছু আলেম দেহবাদী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহকে আকারবিশিষ্ট বা সাকার বলতে ভয় পায়। তাই তারা নিরাকারের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের বিপদমুক্ত মনে করেন। আবার অনেকে আল্লাহর আকার কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর না জানার কারণেও নিরাকার বলে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়া উভয়টাই সমান অপরাধ। মারাত্মক ভুল হলো এমন প্রশ্ন করা যে, আল্লাহর আকার কেমন? এই প্রশ্ন করাও হারাম এবং উত্তর দেওয়া হারাম। এরূপ প্রশ্ন করার যেমন অনুমোদন ও দলীল কুরআন-সুন্নাহতে নেই, উত্তর দেওয়ারও অনুমতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই।

**(২) আল্লাহর সাকার প্রশ্নে সংশয়বাদী :** এক্ষেত্রে অনেক ছহীহ আক্বীদার বাঘা বাঘা আলেমও জড়িয়ে গেছেন। তারা বলে থাকেন, আল্লাহ নিরাকার নন, সাকারও নন। কিন্তু এ ব্যাপারে সন্তোষজনক দলীল দেওয়া হয় না। এর কারণ আল্লাহর আকার নিরাকার এই শিরোনামে সালাফদের থেকে আক্বীদা বিষয়ক কোনো অধ্যায় তেমন চোখে পড়ে না বললেই চলে। যার জন্য অধিক সতর্কতার কারণে হয়তো মধ্যমপন্থা অবলম্বন হিসেবে تَوَقُّف ক্ষান্ত থাকার নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ এইসব উদ্দেশ্যের কারণে তাদেরকে নেকীও দিতে পারেন।

আমার জানা মতে, এই মাসআলাটি ভারতউদ্ভূত ও ভারতসংশ্লিষ্ট আক্বীদাগত বিষয়। জাহমিয়া ও মু‘তাজিলারা আল্লাহর তানযীহের কারণে আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক আলেম এটা করে আল্লাহ নিরাকার এইজন্য, আল্লাহকে সাকার বলা যাবে না। এর দ্বারা যদি এই উদ্দেশ্য পোষণ করা হয় যে, তিনি দেহবিশিষ্ট নন, তাহলে তো কিছুটা ঠিক আছে। কিন্তু সাকার বা আকারবিশিষ্টই বলা যাবে না এমন বিশ্বাস করা হলে তখন সেটা অবশ্যই আপত্তিকর হবে। ভারতবর্ষের আহলেহাদীছ তথা ছহীহ আক্বীদার আলেমগণ আল্লাহকে সাকার বলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন, তারা কয়েকটা দলীলের সূত্র ধরে আল্লাহকে সাকার বলেন। যথা :

**(ক) رُؤْيَةُ اللهِ আল্লাহর দর্শন বা দীদার :** কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ভূরিভূরি দলীল পাওয়া যায় যে, মুমিনরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে।[১]

আল্লাহ সাকার বা আকারবিশিষ্ট হওয়ার বা বলার অর্থ আল্লাহ দর্শন ও দীদারযোগ্য সত্তা। কারণ নিরাকার জিনিস কখনো দর্শন ও দীদারযোগ্য হয় না। উল্লেখ্য যে, নবী ﷺ-এর যুগের মুমিন ছাহাবীরাই শুধু নয়; বরং সকল মুমিন মুসলিমের একটা অদম্য আশা-আকাঙ্ক্ষা যে, আল্লাহকে দেখবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ দর্শন ও দেখা দিয়ে তাদের সে আশা পূর্ণ করবেন। এমনকি মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শর্তযুক্তভাবে দেখা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু শর্তে টিকেননি *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৪৩)*।

**(খ) لِقَاءُ اللهِ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ :** বহু আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের সাক্ষাতের লোভ দেখিয়েছেন। ‘সৎ আমল করো,

১. আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২৩; ইউনুস, ১০/২৬, ‘যিয়াদাহ’-এর তাফসীরসহ; ছহীহ মুসলিম, ১৮১/২৯৭; তিরমিযী, হা/২৫৫২, ৩১০৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭; এছাড়াও আল্লাহর দীদার বিষয়ে আরও বহু হাদীছ রয়েছে— ছহীহ বুখারী, হা/৮০৬; আবূ দাঊদ, হা/৪৭৩০।



www.al-itisam.com

আমার সাক্ষাৎ পাবে' *(আল-কাহফ, ১৮/১১০)*। যারা কাফের, তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ চায় না। এরকম আয়াত কুরআন মাজীদে প্রায় ১৫/১৬টি রয়েছে। আল্লাহর সাক্ষাৎ ও দীদার এ দুটি বিষয় প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এ দুটি ছিফাতই আল্লাহর সাকার হওয়া অনিবার্য করে দেয়। আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাঁর দীদার দর্শন হচ্ছে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান নেয়ামত।

**(গ) ذَاتُ اللهِ আল্লাহর যাত বা সত্তা :** আল্লাহর যাত বা সত্তার সাথে তার বহু ছিফাত জড়িত। যেমন- চেহারা, হাত, দুই হাত, পা, চক্ষু, গোছা ইত্যাদি ছিফাত। এগুলো ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলো ছিফাতের নির্দেশনা হলো আল্লাহ সাকার, দীদার ও দর্শনযোগ্য সত্তা। ক্বিয়াস বা অনুমানভিত্তিক ছিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন- মুখ-নাক, কান, চুল, গলা, কপাল, পেট, পিঠ, ইত্যাদি।

**(ঘ) صُورَةُ اللهِ আল্লাহর ছুরত :** আল্লাহর যাতের আকার-আকৃতিতে ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর صُورَةُ (আকার) উল্লেখসহ ছহীহ বুখারী বর্ণিত হাদীছ,

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ (وفي رواية : في صورته) الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا.

'ক্বিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, বলা হবে- যে যার ইবাদত করতে, তার অনুসরণ করো। ফলে, যারা সূর্যের পূজা করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে। আর যারা চন্দ্রের পূজা করত, তারা চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা ত্বাগূতসমূহের ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অতঃপর আল্লাহর ইবাদতকারীরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মধ্যে মুনাফেক্বরাও থাকবে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় আকৃতি ব্যতীত অন্য আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন, যা তারা চিনে না। অতঃপর বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালক'। মুমিনগণ বলবেন, আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই অবস্থান করব, আমাদের প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত। যখন আমাদের রব আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনে নিব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর স্বীয় আকৃতিতে আসবেন, যেটা তাদের নিকট পরিচিত। অতঃপর বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালক'। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক'।[২]

**আল্লাহর আকার ও নিরাকার বিষয়ে ব্যাকরণ :** এ ব্যাপারে ব্যাকরণ হচ্ছে সূরা আশ-শূরার ১১ নং আয়াতের শেষাংশ।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ 'তাঁর (আল্লাহর) সাদৃশ্য কিছুই নেই অথচ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'। এই আয়াতাংশের দুটি ভাগ রয়েছে। দ্বিতীয় অংশ গোপন করে শুধু প্রথমাংশ 'আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই' গ্রহণ করলে নিরাকারের দলীল হয়। আর উভয় অংশ গ্রহণ করলে আল্লাহ সাকার সাব্যস্ত হয়। তবে আল্লাহর আকারের মতো কারো আকার নেই, যেমনভাবে তাঁর শ্রবণের মতো কারো শ্রবণ নেই, তাঁর দর্শনের মতো কারো দর্শন নেই অর্থাৎ তাঁর আকার তাঁরই মতো।

## চতুর্থ প্রশ্ন : 'বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী?'

বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের বিষয় তাওহীদ ও ইবাদত এবং দ্বীন বলতে যা বুঝায়। মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'আর আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৬৬)*।

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ما دِينُكَ؟ 'তোমার দ্বীন কী?' দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো হাদীছে জিবরীলে উল্লিখিত হয়েছে। গোটা দ্বীন পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। কমপক্ষে মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

কবরের তৃতীয় প্রশ্ন, مَنْ نَبِيُّكَ؟ 'তোমার নবী কে?' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অবশ্যই তাঁর সঠিক পরিচয় ও হক্বসমূহ জানতে হবে ও আদায় করতে হবে এবং কেবল তাঁর দিয়ে যাওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুসলিম হিসাবে প্রত্যেককে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কেননা আক্বীদা সঠিক না হলে আমল কাজে আসবে না। সঠিক আক্বীদার উপরই নির্ভর করে আমলের ক্ববূলিয়াত। যে রবের ইবাদত করব তাকে চিনতে ভুল করলে পরকালে আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭৩, ৭৫৩৭, ৭৪৩৯।



www.al-itisam.com

# সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(সেপ্টেম্বর'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

আল্লাহ তাআলা আপনাকে, আমাকে শরীরিক সুস্থতা দান করেছেন, খাদ্য ও পানীয় এর ব্যবস্থা করেছেন, আবাসনের জন্যে যমীনকে উপযুক্ত করেছেন— এসবই তাঁর নিয়ামত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ 'কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তা হচ্ছে নিয়ামত। তাকে বলা হবে আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি এবং সুশীতল পানির মাধ্যমে তোমাকে তৃপ্ত করিনি?'[১] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ﴾ 'তারপর তোমাদেরকে সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(আত-তাকাছুর, ১০২/৮)*। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের কোন নিয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে? আমাদের নিকট তো শুধু দুইটি জিনিস (খেজুর ও পানি) রয়েছে, আর সর্বদা শত্রু প্রস্তুত রয়েছে এবং আমাদের তরবারিগুলো আমাদের কাঁধে ঝুলন্ত রয়েছে? তিনি বললেন, إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ 'এটা অদূর ভবিষ্যতে হবে'।[২] তাই অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে প্রত্যেকের আল্লাহ তাআলার নিকট শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা তাঁর প্রদত্ত সকল নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার যমীনে বসবাস করে তার নিয়ামত উপভোগ করে শুকরিয়া আদায় করার জন্য সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করাই হবে আমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মোদ্দাকথা, সূরা আন-নাবার শেষাংশ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যমীন। মানুষের আরাম-আয়েশে বসবাস, চাষাবাদ করে হালাল জীবিকা উপার্জন এবং ফল-ফসলাদি উৎপাদন করে খাওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা এই যমীনকে বিছানাস্বরূপ তৈরি করেছেন। গোশত ভক্ষণ করার জন্য পশু-পাখির সৃষ্টি, নিরাপদে বসবাসের জন্যে পাহাড় দিয়ে পৃথিবীকে সুদৃঢ়করণ, আকাশকে ছাদস্বরূপ এবং তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে খাদ্য উৎপাদন এ সবই মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয়েছে। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য অফুরন্ত অনুগ্রহ। তাই আমাদের উচিত হবে, আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই পেশ করা। তার সাথে কাউকেও অংশীদার করা হতে বিরত থাকা। আল্লাহ যেন আমাদের তাঁর নিয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান করেন। ইবাদত-বন্দেগী করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার সুযোগ দান করেন- আমীন!

**(৩) মহান আল্লাহ মানবজাতিকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেন :** আমাদের পূর্ব ইতিহাস লক্ষ করলে বুঝতে পারব যে, আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম আমাদের সবার আদি পিতা-মাতা। এভাবে আজ অবধি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মায়া-মহব্বতের বন্ধনে পরিবার গঠিত হয়। জন্ম নেয় সন্তানসন্ততি। তারা পরস্পরের জন্য দু'আ করেন। সন্তানসন্ততি পিতা-মাতাকে ভালোবাসে, অনুরূপভাবে পিতা-মাতাও সন্তানসন্ততিকে অনেক ভালোবাসেন। এভাবেই মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে আসে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ 'আমি তোমাদের জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি' *(আন-নাবা, ৭৮/৮)*। স্বামী বা পুরুষ মানুষ বাইরে কাজ-কর্ম করে এবং নারীরা বাড়ির কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে, সন্তানসন্ততি লালনপালন করে। মূলত মা হলো জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, একজন আদর্শ মা'ই পারে আদর্শ সন্তান, আদর্শ পরিবার উপহার দিতে, আদর্শ সমাজ গড়তে। তাইতো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা যত বেশি গভীর হবে, ততবেশি সন্তানসন্ততি নিয়ে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি

* এম. এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৩৫৮, হাদীছ ছহীহ।

২. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৩৫৭, হাদীছ হাসান লিগয়রিহী।



www.al-itisam.com

করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে' *(আর-রূম, ৩০/২১)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ 'হে মানুষেরা! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাক্বী, আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ - وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

'আমি আকাশ বানিয়েছি আমার (নিজ) হাতে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী এবং আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি! আমি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৪৭-৪৯)*। তাইতো স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য দু'আ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ 'আর যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালনক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের চক্ষু শীতলকারী এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের প্রতিনিধি বানান' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৪)*। দু'আটি যেমন স্বামী পড়বে, তেমনি স্ত্রীও পড়বে। এটি যেমন যুবক পড়বে, তেমনিভাবে যুবতীও পড়বে। এভাবে আমরা একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করব, সন্তানসন্ততির জন্য দু'আ করব, যাতে তারা মুমিন ও মুত্তাক্বী হতে পারে এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শে আদর্শবান হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 'নিশ্চই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)*।

তাই মানব জীবনের কল্যাণার্থে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বয়স হলে বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের) আমাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তিনি বললেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন ছিয়াম আদায় করে। কেননা, এটা তার যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।[৩] বিয়ের সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করাটাই তার জন্য কল্যাণকর। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ, সে তোমাদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব করলে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে'।[৪] ছেলে-মেয়েকে দ্বীনদার পরহেযগার দেখে বিয়ে দেওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'মহিলাদের বিয়ে করা হয় তাদের দ্বীনদারী, ধনসম্পদ, বংশমর্যাদা ও সৌন্দর্য দেখে। অবশ্যই তুমি দ্বীনদার পাত্রীকে বেশি অগ্রধিকার দিবে। কল্যাণে তোমার হাত পরিপূর্ণ হবে'।[৫] আজকে বর্তমান সমাজে আমরা শুধু টাকা-পয়সা ও ধনসম্পদ এ বিষয়গুলো বেশি লক্ষ করি, ছেলে অথবা মেয়েটা ছালাত আদায় করে কিনা, সে কুরআন পড়তে পারে কিনা, সে কোনো মাযারপূজায় বিশ্বাস করে কিনা, তার আক্বীদাগত কোনো ত্রুটি আছে কিনা, ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে আছে কিনা, এসব বিষয় লক্ষ করা দরকার। এসব দেখার আগেই একে অপরের প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা হয়ে গেছে।

আপনি তো বাবা, আপনি তো মা, আপনার মেয়ে কোথায় যাচ্ছে খোঁজ খবর তো রাখছেন না, আপনার ছেলে কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা, আপনি তো একটিবারও খোঁজ নেননি। যখন তারা একে অপরে কোর্ট ম্যারেজ করছে, তখনই আপনার মাথায় হাত পড়ছে। কারণ কোর্ট ম্যারেজ করে বিয়ে হয় না। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, 'অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না'।[৬] আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল'।[৭] পবিত্র কুরআনে সূরা আন-নাবার শিক্ষা থেকে আমরা যা পাই, তা হলো মহান আল্লাহ মানবজাতি, জিনজাতি

৩. তিরমিযী, হা/১০৮১।
৪. তিরমিযী, হা/১০৮৪।
৫. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, হা/১০৮৬।
৬. তিরমিযী, হা/১১০১, সনদ ছহীহ।
৭. তিরমিযী, হা/১১০২, সনদ ছহীহ।



www.al-itisam.com

এবং যে সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তাদের মাঝে নারী-পুরুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতি হলো মানুষ। এদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ করেছেন, যাতে করে তাদের উভয়ের মিলনে সন্তানসন্ততি হয় এবং তারা আ'মালে ছালেহা করে, অন্যায়-অপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং নিজ সন্তানদের আদর্শবান করে গড়ে তুলে। তাইতো লোক্বমান হাকীমের উপদেশ প্রতিটি পিতা-মাতা সন্তানসন্ততি গ্রহণ করলে তাদের জীবনে কল্যাণ বয়ে আসবে। লোক্বমান হাকীম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন লোক্বমান তার পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিল আর বলছিল, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক মহাঅন্যায়। আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই দিকে। তারা উভয়ে যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

হে বৎস! তা (পুণ্য ও পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশ কিংবা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয় তিনি খবর রাখেন। হে আমার প্রিয় সন্তান! ছালাত ক্বায়েম করবে, ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (অহংকার করে) তুমি মানুষ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোক্বমান, ৩১/১৩-১৯)*। মোদ্দাকথা, আল্লাহ তাআলার এটা একটা বিশেষ নেয়ামত যে, তিনি নর-নারী জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সন্তানসন্ততি হয়ে একে অপরের প্রতি মায়া-মহব্বত সৃষ্টি হয়। তারা আরাম-আয়েশে বসবাস করতে পারে। একে অপরকে পরামর্শ দিবে এবং একে অপরের জন্য দু'আ করবে, স্ত্রী-স্বামীর কথামতো চলবে- যদি শরীআতের সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়। স্ত্রী-স্বামীর আনুগত্য করবে, সম্মান করবে। অনুরূপ স্বামী তার স্ত্রীকে সম্মান-মর্যাদা দিবে, স্ত্রীকে কোনো অশ্লীল কথাবার্তা বলে গালিগালাজ করবে না, তার হক্ব ঠিকভাবে আদায় করবে। স্ত্রী ও স্বামীর হক্ব ঠিকভাবে আদায় করবে। সন্তানসন্ততিদের আদর্শ দিয়ে মানুষ করবে। সন্তানদের প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা শেখাবে, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করা যাবে না, আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে কসম করা যাবে না ইত্যাদি। মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যাবে না এবং তার নিকট মানত মানা যাবে না। কবরের পার্শ্বে নীরবতা পালন করা যাবে না।

বিদআত সম্পর্কে ধারণা দিবেন, যাতে সকল প্রকার বিদআত থেকে দূরে থাকতে পারে। কারণ বড় শিরক করলে তার অতিতের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আর বিদআত করলে তার আমল কবুল হবে না। এজন্যই বিদআতী বিষয় জেনে তার থেকে সাবধান থাকতে হবে। সন্তানের বয়স সাত বছর হলে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বাবা ছেলেদের নিয়ে মসজিদে যাবেন। মা মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে হাসি-খুশি থেকে ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ দিবেন। বাবা ছেলে সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময় হাশিমুখে থাকবেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, আমরা ছালাত আদায় করলে আব্বু-আম্মু খুব খুশি হন। সন্তানের বয়স ১০ বছর হলে ছালাত না পড়লে বেত্রাঘাত করবেন। বাড়িতে অবশ্যই আদবের বেত থাকতে হবে। ১০ বছর বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দিবেন। বাবা সন্তানসন্ততি ও মাকে নিয়ে ফজর ছালাতের পর কুরআন তেলাওয়াতের চেষ্টা করবেন। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করবেন, তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত হবেন। নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করবেন, হজ্জ ফরয হলে তা আদায়ের চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম রাখবেন এবং সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখার চেষ্টা করবেন। হালাল রূযী ভক্ষণ করবেন এবং সকল প্রকার হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। সূদ-ঘুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। মিথ্যা বলা, মুনাফিক্বী করা, গীবত করা, যেনা-ব্যভিচার করা ও মানুষের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। পরিবারের সকলে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করবেন।

*(চলবে)*

# ঘটনাবহুল আফগান শাসনের অতীত ও বর্তমান

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

আফগানিস্তান অসংখ্য পাহাড়বেষ্টিত একটি দেশ। এটিকে দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আফগানিস্তানের পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তান। পশ্চিমে ইরান। উত্তরে তুর্কেমিনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তান। আর এর উত্তর-পূর্বে গণচীন অবস্থিত। আফগানিস্তান একটি রূঢ় আবহাওয়ার দেশ। এর অধিকাংশ এলাকা পর্বত ও মরুভূমি দ্বারা আবৃত। উত্তর দিকে কিছু সমভূমি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কিছু গাছপালা রয়েছে। গ্রীষ্মকালে আফগানিস্তানের আবহাওয়া গরম থাকে। আর শীতকালে এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে। আফগানিস্তান প্রাচীনকাল থেকেই এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। অনেক প্রাচীন বাণিজ্য এবং বহিরাক্রমণ এ দেশের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু লোক আফগানিস্তানের মধ্য দিয়েই চলাচল করেছে। অনেক জাতি এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এ দেশে বসবাসরত সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী হলো পশতুন জাতি। ৫০ হাজার বছর আগে থেকেই আফগানিস্তানে মানুষের বসতি ছিল। আফগানিস্তানকে অনেক জাতি শাসন করেছে মর্মে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আফগানিস্তান রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা ও সৈয়দ মুজতবা আলীর আব্দুর রহমানের দেশ হিসেবেও পরিচিত। সম্প্রতি তালেবানদের অগ্রযাত্রায় আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকার পতন হয়। ফলে বিশ্বমিডিয়ার সংবাদ মাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হয়ে পড়ে আফগানিস্তান। বিশ্ববাসীর মতো বাংলাদেশীদের কাছেও আফগানিস্তানের হাড়ির খবর জানার আগ্রহ বেশ লক্ষণীয়। আফগানিস্তান একটি হতদরিদ্র সার্কভুক্ত দেশ। তবে এর রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আফগানিস্তানে জন্ম নেওয়া নানা গোত্র বিভিন্ন কারণে বেশ প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে হিন্দুস্থানে শাসনকার্যে এসকল প্রসিদ্ধ গোত্রের মানুষেরা ব্যাপক অবদান রেখেছে। আধুনিক যুগে উপমহাদেশের রাজনীতিতেও তাদের নামের সংশ্লিষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। সিনেমা, সংগীত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের অনেক খানেরা। জড়িয়ে আছে কাপুরেরা, আফ্রিদিরা এবং আরও অনেকে। এসব খান, কাপুর আর আফ্রিদিদের পূর্বপুরুষের শিকড় এই আফগানিস্তান। দূর অতীতের অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছে আফগানিস্তান ছিল একটি সরাইখানার মতো। মরুময় ঝাঁঝালো আবহাওয়া ডিঙিয়ে তারা আসত সিন্ধু, পাঞ্জাব আর বাংলার উর্বর সবুজ ভূমির দিকে। পাহাড়-পর্বত, বনবাদাড়ের চড়াই-উতরাই মাড়িয়ে তাদের সাক্ষাৎ মিলত গিরিপথের উপর দাঁড়ানো এক সরাইখানার সাথে। আর সে সরাইখানা হলো আফগানিস্তান। অভিবাসন প্রত্যাশীর সকলকেই এ সরাইখানার আতিথেয়তা কিংবা শত্রুতা গ্রহণ করতে হতো। দুটোর যেকোনো একটা গ্রহণ করেই তারপর সামনে এগুতে হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে এখানে অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষজন আসতে শুরু করে। আফগানিস্তান শাসন ও দখলের নিমিত্তে অনেকেই সেখানে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে নাই। দখলদার ঔপনিবেশকরা পরাজিত হয়েছে। লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। অবশেষে আত্মসমর্পণের গ্লানি নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। দীর্ঘ পরিক্রমায় একের পর এক আফগানিস্তানের হাতবদল হয়েছে। দেশটি অতীতে পারস্য, গ্রীস, সেলুসিড, মৌর্য, আরব, মঙ্গল, খোয়ারিজম ও তিমুরীয় শাসকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য এই আফগানিস্তান দখল করে নেয়। তারা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সালে মহামতি আলেকজান্ডার পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করে আফগানিস্তানের দখল নেয়। দখলে নিয়েই আলেকজান্ডার বলেছিলেন, আফগানরা 'অপরাজেয়'। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এশিয়ার কুশান জাতি আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে হুন নামের মধ্য এশিয় এক তুর্কি জাতি কুশান জাতিকে পরাজিত করে। সপ্তম শতাব্দীতে আফগানিস্তানে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। আরব মুসলিমরা পশ্চিমের হেরাত ও সিস্তান প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। দশম শতাব্দীতে উজবেকিস্তানের বুখারা থেকে একদল মুসলিম শাসক আফগান এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। একই সময়ে এখানে গজনবী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হয়। গজনীর সর্বশেষ রাজা ছিলেন মাহমূদ গজনবী। তিনি ৯৯৮ সাল থেকে ১০৩০ সাল পর্যন্ত এই এলাকা শাসন করেন। তিনি প্রায় সকল হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে আফগানিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় আফগানিস্তান সাহিত্য ও শিল্প নগরীতে পরিণত হয়। মাহমূদ বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার মধ্যে রয়েছে ইতিহাসবিদ আল-বিরুনী ও মহাকবি ফেরদৌসী। মাহমূদের মৃত্যুর পর গজনীর প্রভাব হ্রাস পায়। ১২০০ শতাব্দীতে পশ্চিম-মধ্য আফগানিস্তানে ঘুরি রাজ্য

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।



www.al-itisam.com

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২১৫ সালে খোয়ারিজমি শাহদের কাছে ঘুরি রাজ্যের পতন ঘটে। ১২১৯ সালে মঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিস খান খোয়ারিজিমিদের পরাজিত করেন। ১৪০০ শতাব্দীতে তৈমুর লং আফগানিস্তান জয় করেন। ঘুরি থেকে তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের শাসনামলে এখানে ইসলামী স্থাপত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। এ সময় তৈরি হয় মসজিদ, মাদরাসা, মিনার ও মাজার-ই-শরীফ। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশা জহির উদ্দিন বাবর ১৫০৪ সালে কাবুল ও কান্দাহার দখল করে নেয়। ১৫২৬ সালে বাবর ভারতে আক্রমণ করেন। তিনি লোদী বংশকে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ূনকে দিল্লির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আর অন্য তিন পুত্র কামরান মির্জা, আস্কার মির্জা ও হিন্দাল মির্জাকে কাবুল, কান্দাহার ও বদকশান শাসনের দায়িত্ব প্রদান করেন। মোগলদের সময়ে কাবুল, দিল্লি ও আগ্রা একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। পরবর্তীতে ১৫৪৫ সালে বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ূন কাবুল, কান্দাহার, গজনী ও বদকশানের একচ্ছত্র শাসক হন। দিল্লি থেকেই তখন আফগানিস্তানের প্রদেশগুলো মোগলদের দ্বারা শাসিত হতো।

১৭৪৭ সালে আবির্ভাব ঘটে আহমাদ শাহ দুররানির। তিনি ছিলেন তেহরানের প্রতাপশালী সেনাপতি নাদির শাহের অনুগত এক সেনাধ্যক্ষ। কান্দাহার শহরকে রাজধানী করে দুররানি সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, গজনী ও পেশাওয়ার নিয়ে জন্ম হয় আধুনিক আফগানিস্তানের। তিনি আফগানিস্তানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আর কালক্রমে এক শক্তিশালী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। তার মৃত্যুর পর পুত্র তৈমুর শাহ আফগানিস্তানের রাজধানী কান্দাহার থেকে কাবুলে স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯৩ সালে তৈমুরের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র জামান শাহ, মাহমূদ শাহ, সুজা শাহ ও অন্যান্যরা সিংহাসনে আরোহন করেন। এ সময়ে আফগানিস্তান নিয়ে সর্বপ্রথম বেপরোয়া নাক গলানো শুরু করে ব্রিটিশরা। তারা ১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালায়। ১৮৪২ সালে তারা আফগানিস্তান দখল করে নেয়। আফগানিস্তান আবার পরাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে আফগানিস্তানের শাসক ছিলেন হাবীবুল্লাহ খান। ১৯১৯ সালে তুরস্কের অনুসারী বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করে। তার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আমানুল্লাহ খান। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। দীর্ঘ যুদ্ধে ইংরেজরা ক্লান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা পরাজয় বরণ করে। এসময় কাবুলে ব্রিটিশ সৈন্যসহ মোট ১৬০০০ ব্রিটিশ নাগরিক অবস্থান করছিল। আফগান যোদ্ধারা তাদেরকে খায়বার গিরিপথ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ব্রিটিশদের অতিরিক্ত নাক গলানোর কারণে এদের প্রায় সকলকেই আফগান যোদ্ধারা হত্যা করে। মাত্র একজন সৈনিকডাক্তার ঘোড়ার পিঠে ঝুলতে ঝুলতে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এটাও সম্ভব হয়েছিল আফগানদের ইচ্ছাতেই। কারণ তারা চেয়েছিল অন্তত একজন ব্রিটিশ যেন ফিরে গিয়ে তাদের করুণ পরিণতির কথা ব্রিটিশদের কাছে বলতে পারে। স্বাধীনচেতা আফগান শাসক আমানুল্লাহ ইংরেজদের ক্ষমতা খর্ব করেন। আফগানিস্তানকে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ১৯২৯ সালে দেশে আবার অস্থিরতা নেমে আসে। ক্ষমতা দখল করেন হাবীবুল্লাহ কালাকানি নামে এক দস্যু সর্দার। ১৯৩০ সালে আফগানিস্তানের নতুন শাসক হন জহির শাহ। তিনি একটানা ৪০ বছর আফগানিস্তান শাসন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক রাজতান্ত্রিক শাসন চলমান থাকে। ১৯৭৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জহির শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। এতে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। প্রজাতন্ত্র হিসেবে আফগানিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখন মুহাম্মাদ দাঊদ খান। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন বামপন্থী সামরিক নেতা নূর মুহাম্মাদ তারাকি। অতঃপর ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেন পিপলস পার্টি ও ব্যানার পার্টি। এ সরকারের নাম দেওয়া হয় বামপন্থী পিডিপিএ। এ সরকারের কোনো জনপ্রিয়তা ছিল না। এ সরকারটি ছিল সোভিয়েতের অনুগত তাবেদার বাহিনী। ব্রিটিশদের আদলে এসময় আফগানিস্তানে শুরু হয় সোভিয়েত রাশিয়ার আনাগোনা। তাদের অনুগত সরকারকে সমর্থন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করে। স্বাধীনচেতা আফগানরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করে। তারা ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তারা মাত্র ৬ মাস আফগানিস্তানে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সেদেশে অবস্থান করেছিল ১০ বছর। তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নায়ুযুদ্ধের ময়দান হয়ে উঠেছিল এই আফগানিস্তান। আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ শুরু হয়ে চলে দীর্ঘ ১০ বছর। এ যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত হয় লক্ষ লক্ষ আফগান নাগরিক। ২৮ লাখ আফগান পাকিস্তানে এবং ১৫ লাখ আফগান ইরানে আশ্রয় নেয়। এখনো প্রায় ২০ লাখেরও বেশি আফগান নাগরিক পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের শরণার্থী শিবিরে

জীবনযাপন করছে। সহিংসতার কারণে যাদের অনেকেই দেশে ফেরার ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। সংঘটিত এ যুদ্ধে ধ্বংস হয় মূল্যবান স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান। এসময় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি ও শহুরে গোষ্ঠীগুলো তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। যাদের একটি গ্রুপকে বলা হতো আফগান মুজাহিদীন। আফগান মুজাহিদরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা অব্যাহত রাখে। পিডিপিএ সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর আফগান মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করত যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সঊদী আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ। ক্রমাগত মুজাহিদ বাহিনী গেরিলা হামলা জোরদার করতে থাকে। সোভিয়েত বাহিনী ক্লান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। অতঃপর তারা ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে। চুক্তি মোতাবেক ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায় ১৯৮৯ সালে। কিন্তু তারা সে দেশে রেখে যায় তাদের তাবেদার সমর্থক গোষ্ঠিকে। আর তাদের এ তাবেদার গোষ্ঠির সাথে বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলমান থাকে। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সংঘটিত এসব যুদ্ধের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে তালেবান নামক একটি সশস্ত্র ইসলামী সংগঠন। ১৯৯৬ সালে তালেবান তাদের অস্তিত্বের জানান দেয়। তালেবানরা এসময় সংগঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আল-ক্বায়েদা নামে আরেকটি ইসলামিক গ্রুপকে তালেবানরা আফগানিস্তানে আশ্রয় দেয়। মুজাহিদ বাহিনীর একটা গ্রুপ তালেবানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তালেবানরা ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে নেয়। জিহাদী এ গ্রুপগুলো ইসলামী রাষ্ট্র ক্বায়েমের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের দাপট ছিল। তালেবানরা দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা ১৯৯৮ সালের মধ্যে আফগানিস্তানের পুরো নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তালেবানরা সরকার গঠন করে। তারা ইসলামী শরীআহ মোতাবেক দেশ পরিচালনা শুরু করে। উল্লেখ্য, এ সময় পর্যন্ত তালেবানদেরকে আমেরিকা মিত্র শক্তি হিসেবে মনে করত। স্বাধীনচেতা আফগানরা স্বাধীনভাবে দেশ চালাতে থাকে। আর এতে ক্রমান্বয়ে নাখোশ হতে থাকে দীর্ঘদিনের মিত্রশক্তি আমেরিকা। অতঃপর তালেবানের ঘরে সন্ত্রাসের অজুহাত খুঁজতে থাকে বিশ্বমোড়ল আমেরিকা। ঠিক এ সময়েই ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে এক নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ২৫০০ জন আমেরিকান নাগরিক নিহত হয়। আমেরিকা এ হমলার জন্য আফগানিস্তানে আশ্রয় নেওয়া উছামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তালেবানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তালেবানরা তাদের অতিথি উছামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। অতঃপর ঠুনকো এ অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী আফগানিস্তানে একযোগে হামলা চালায়। ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানে চলে এ হামলা। আর এতদিন পর্যন্ত আমেরিকা অবস্থান করে আফগানিস্তানে! তালেবানদের উপর পৃথিবীর সর্বাধুনিক অস্ত্র ও শক্তি প্রয়োগ করে আমেরিকা। তারা দেশটিকে পদানত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। দীর্ঘ দুই দশক ধরে তালেবানরা মার্কিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই চলল। যুদ্ধের পুরোটা সময় তারা পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলল। স্রষ্টায় বিশ্বাস আর অদম্য মনোবলই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। এ মনোবলের উপর ভর করেই তালেবানরা যুদ্ধ চালিয়ে গেল দীর্ঘ এত বছর! এ যুদ্ধে আমেরিকার ব্যয় হয়েছে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। প্রাণ হারিয়েছে অগণিত সৈন্য। মূলত শান্তির ছদ্মাবরণে মার্কিনীরা চেয়েছিল আফগানিস্তানে একটি পশ্চিমা ঘেঁষা শাসন ক্বায়েম করতে। কিন্তু আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর এ চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে সেটা বুঝা যাচ্ছিল ২০১১ সালেই। কারণ এ বছরই তালেবানের সাথে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করে আমেরিকা। আর আমেরিকার আত্মসমর্পণের পথ উন্মোচন করে দেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ স্বাক্ষরিত চুক্তি নিশ্চিত করে যে, তালেবানদের সম্ভাব্য বিজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসেন। তিনি তার দেশের নিশ্চিত পরাজয়টি বিলম্ব করতে চাননি। ২০২১ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে তাদের সকল সৈন্য ফিরিয়ে নেবেন বলে তিনি ঘোষণা দেন। ইতোমধ্যে তারা সৈন্য ফিরিয়েও নিয়েছে। সৈন্য প্রত্যাহারের আগেই তালেবানরা তাদের হামলা আরো জোরদার করে। এ সময় থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাস অতিবাহিত হয়। এর মধ্যেই ১৫ই আগস্ট ২০২১ তারিখে তালেবানের হাতে রাজধানী কাবুলের পতন ঘটে। মার্কিন সমর্থিত আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সুদীর্ঘ ২০ বছরের হামলায়



www.al-itisam.com

আফগানিস্তান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। আমেরিকা আফগানিস্তানে নির্বিচারে হত্যা চালালো। ধ্বংস করল নানা স্থাপনা। লাখো বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটালো তারা। ড্রোন হামলা চালিয়ে অসংখ্য নিরীহ নারী-শিশুকে পঙ্গু বানালো। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বোমার মালিক আমেরিকা। যার সফল পরীক্ষা চালালো তারা আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর। বিশ্ব বিবেক চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখল।

আলেকজান্ডার বলেছিলেন, আফগানিস্তান হচ্ছে 'অপরাজেয়' একটি দেশ। এর আরেকটি নাম হলো 'সাম্রাজ্যসমূহের গোরস্থান'। নামটি যথার্থ বলেই মনে হয়। কারণ যত বড় বীর এদেশে প্রবেশ করেছে সকলকেই নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে। সকল বীরকেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আলেকজান্ডারের এই কথা কেউ মনে রাখেনি। যারাই আফগানিস্তান দখল করতে গেছে তাদের সকলকেই করুণ পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ শিকার বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকা। তৃতীয় কোনো শক্তি তালেবানদেরকে এবার সাহায্য করেনি। কোনো সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তিতে বিজয়ী হলো তালেবানরা। আমেরিকার রাহুমুক্ত হলো আফগানিস্তান। নিজেদের দেশকে শত্রুমুক্ত করল তালেবানরা। ফলে আবারও স্বাধীন হলো আফগানিস্তান। তালেবানকে বিশ্বপরাশক্তিগুলো একযোগে জঙ্গি আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু তাদের বিজয়ের পর পরাশক্তিদের অনেকেই তালেবানদেরকে সমর্থন করেছে। কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলেও আখ্যা দিয়েছে। চীন, রাশিয়া, তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এবার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, তালেবানরা বিজয়ী হয়ে আমেরিকার সমর্থকদেরকে গুলি করে হত্যা করেনি। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদেও রক্তপাত ঘটায়নি। মানুষ হত্যায় সহযোগিতাকারী দালালদেরকে পাকড়াও-ও করেনি। আমেরিকা ও তার মিত্রদের উপর এখনো পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরং তাদেরকে বিদেশিদের দূতাবাস থেকে বিমানবন্দরে যেতে সহায়তা দিয়েছে। নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে। আপাতত তাদেরকে সহনশীল বলেই মনে হচ্ছে। তালেবানরা মূলত আফগানিস্তানে ইসলামী শরীআহ চালু করতে চায়। তালেবান উপপ্রধান মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার এক ঘোষণায় বলেছেন, তালেবানের মূল লক্ষ্য আফগানিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন করা। তিনি বলেন, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চায় না। তালেবান মনে করে, আফগানিস্তানের সব শ্রেণির মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান। তিনি বলেন, ইসলামী অনুশাসনের আওতায় আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি প্রণিত হবে। মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। নারী অধিকার এবং বাকস্বাধীনতার প্রতি তালেবান সম্মান প্রদর্শন করবে। এছাড়া তালেবান নারীর শিক্ষা ও চাকরির অধিকার নিশ্চিত করবে। তাদের সম্পদের মালিকানা ও ব্যবসা করার অধিকার প্রদান করবে। আর এসব হবে ইসলামী আইন ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

যাহোক, তালেবানরা বিজয় অর্জন করেছে। তাদের দেশকে স্বাধীন করেছে। তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা তাদের স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পাবে এটাই স্বাভাবিক। আর এটা আন্তর্জাতিক বিশ্বের স্বীকৃত রীতিও বটে। এ নীতি অনুযায়ী তারা যে কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। আর এটা তাদের একান্তই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা করা বোকামি ও অনধিকার চর্চার শামিল। কিন্তু তারপরও বিশ্বকে বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ বেশ উতলা হয়ে পড়েছে। দখলদারদের মিত্রদের জন্য তারা বেশ মায়াকান্না করছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে তালেবানরা বিজয় অর্জন করে বড় ভুল ও অন্যায় করে ফেলেছে। মূলত তালেবানরা দেওবন্দী ধারার ইসলামী আন্দোলন ও একটি সামরিক সংগঠন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর। ১৯৯৪ সালে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৬ সালে সংগঠনটি আফগানিস্তানের প্রথম সরকার গঠন করে। ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশের তিন-চতুর্থাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সংগঠনটি তাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইসলামী শরীআহ প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনটি দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের পশতুন ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়। এসব ছাত্ররা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি দেশের অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে দলটি ইসলামী আমিরাত ঘোষণা করে। কান্দাহারকে তারা রাজধানী ঘোষণা করে। সে সময় তালেবান সরকারকে পাকিস্তান, সঊদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ তিনটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

**(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২০ নং পৃষ্ঠায়)**

# ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ

*মূল : প্রফেসর কে এস রামাকৃষ্ণ রাও**
*অনুবাদ ও পরিমার্জন : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী***

(শেষ পর্ব)

উদাহরণস্বরূপ মাহাত্ম্য যদি এর মধ্যে থাকে, যে কোনো এমন জাতির সংস্কার করা যে জাতি বর্বরতায় প্লাবিত ও নৈতিক অন্ধকারে নিমজ্জিত তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই মহৎ। কারণ তিনি আরবের মতো অত্যন্ত নিমগ্ন জাতিকে মুক্ত ও পবিত্র করে তোলেন এবং তাদেরকে সত্যতা ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বানিয়ে দেন। তাঁর কাছে এই মাহাত্মের পুরো দাবি রয়েছে। মাহাত্ম বলতে যদি কোনো একটি সমাজের পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে ভ্রাতৃত্ব এবং দানশীলতার সূত্রে বেঁধে দেওয়াকে বোঝায়, তাহলে মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া এই নবী মুহাম্মাদ ﷺ নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের অধিকারী। মহত্ত্বের অর্থ যদি হয় ঐ মানুষদের সংশোধন ও পবিত্র করা, যারা অন্ধ কুসংস্কার ও সকল ক্ষতিকারক প্রথাতে জড়িত, তাহলে বলতে পারি যে, ইসলামের পয়গম্বর লক্ষ লক্ষ মানুষকে কুসংস্কার ও অযৌক্তিক ভয় থেকে মুক্তি দান করেছেন। যদি বলি, মহত্ত্ব এক উচ্চতর নৈতিক মান, তাহলেও বলতে পারি যে, মুহাম্মাদ ﷺ শত্রু-মিত্র সবার কাছেই ছিলেন আল-আমীন ও আছ-ছাদিক্ব অর্থাৎ পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। যদি বিজেতা মহান ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি অসহায়, অনাথ ও সাধারণ ব্যক্তির অবস্থা থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন এবং খসরু ও কিসরার মতো আরবদের শাসক হয়েছিলেন। তিনি এমন এক মহান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যা চৌদ্দশ বছর ধরে এখনও অক্ষত। নেতার প্রতি যে আনুগত্য ও ভালোবাসা, তাকেও যদি মহত্ত্বের পরিচয় বলে বিবেচনা করি, তাহলে দেখব এই নবী ﷺ-এর নামের শক্তি ও মহিমা আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি হৃদয়কে মোহিত করে।

**নিরক্ষর নবী :** তিনি এথেনস, রোম, পারস্য, ভারত, কিংবা চীনের বিদ্যালয়ে দর্শণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু তিনি মানবজাতিকে দিয়েছেন চিরকল্যাণকর এক মহাসত্যের বাণী। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু এমন বাগ্মিতা ও সৌরভের সাথে কথা বলতেন যে, শ্রোতারা কান্নায় ভেঙে পড়তেন। তিনি অনাথ ছিলেন এবং পার্থিব পণ্যও ছিল না তাঁর, কিন্তু সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কোনো সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি ভয়াবহতম অবস্থাতেও সৈন্যবাহিনী সংগঠন করতেন এবং শুধু নৈতিক শক্তির কারণে বহু বিজয় লাভ করেন।

প্রতিভাবান প্রচারক পৃথিবীতে খুবই বিরল। দেকার্তের মতে, ‘আদর্শ প্রচারক বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বিরল’। হিটলারও তাঁর ‘mein kamp’ মেইন ক্যাম্প গ্রন্থে এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন; বলেছেন, ‘এক মহান তাত্ত্বিক কদাপি এক মহান নেতা হতে পারেন। এর বিপরীত একজন আন্দোলনকারীর মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা অনেক বেশি থাকে। তিনি সর্বদা উৎকৃষ্ট নেতা হবেন। কারণ নেতৃত্ব মানে জনগণকে চালনা ও প্রভাবিত করার শক্তি। নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ও তাত্ত্বিকতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই’। কিন্তু তিনি আগে বলেন, ‘একই ব্যক্তি তাত্ত্বিক, সংগঠক এবং নেতাও হবে এটা এই পৃথিবীতে বিরল, কিন্তু একেই বলে মহত্ত্ব’। সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে যে, রক্তমাংসের মানুষ এই নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে এই দুর্লভতম মহত্ত্ব বিদ্যমান ছিল।

এরচেয়ে আরো বেশি বিস্ময়কর মত বসওয়ার্থ স্মিথ প্রকাশ করেন, তিনি বলেন, ‘তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) যেমন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, তেমনি তিনি ধর্মগুরুও ছিলেন, তিনি বাদশাহও ছিলেন এবং ধর্মনেতাও ছিলেন, তিনি ধর্মগুরু ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে ধর্মগুরুদের ভণ্ডামি ছিল না, তিনি এমন বাদশাহ ছিলেন, যাঁর না ছিল কোনো সৈন্যবাহিনী, না কোনো দেহরক্ষী, না রাজপ্রাসাদ। যদি কোনো ব্যক্তি এটা দাবি করবার অধিকার রাখে যে সে অতি চমৎকারভাবে শাসন করেছেন তাহলে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ। কারণ ক্ষমতার সকল ভিত্তি ও সহায়তা ছাড়াই তাঁর শাসন করার ক্ষমতা ছিল। তিনি ক্ষমতার সজ্জিকরণের কোনো পরোয়া করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে সরলতা ছিল তাঁর প্রশাসনিক জীবনেও সেই সরলতা প্রলক্ষিত’।

**অকৃত্রিম ও অকলঙ্ক মুহাম্মাদ ﷺ :** মক্কা জয়ের পর ১০ লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক ভূমি তাঁর পায়ের নিচে ছিল। সমগ্র আরবের অধিপতি তিনি, অথচ নিজের জুতো নিজেই মেরামত করতেন, মোটা পশমের কাপড় সেলাই করতেন,

* চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, মহীশুর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটক, ভারত।
** পিএইচডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন, ঘর-বাড়ি ঝাড়ু দিতেন, আগুন জ্বালাতেন এবং সংসারের অন্যান্য কাজ নিজেই করতেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকে পুরো মদীনা শহর সম্পদশালী হয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে সোনা-চাঁদি ছিল, অথচ এমন প্রাচুর্যের মধ্যেও আরবের এই সম্রাটের গৃহে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চুলায় আগুন জ্বালানো হতো না। তাঁর খাবার শুধু শুকনো খেজুর আর পানি হতো। তাঁর পরিজনদের অনেক রাত কেটেছে ক্ষুধার্ত অবস্থায়। কারণ তাঁদের কাছে সন্ধ্যায় খাবার জন্য কিছু থাকত না। পুরো দিন ব্যস্ত থাকার পর তিনি রাত্রে খেজুর পাতার মাদুরে ঘুমাতেন, তিনি কখনো নরম বিছানায় শয়ন করেননি, অধিকাংশ রাত্রি ইবাদতে কাটাতেন। প্রায়ই তিনি আপন স্রষ্টার কাছে কান্নাই ভেঙে পড়তেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন যে, তিনি যেন তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালন করার শক্তি প্রদান করেন। বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি এমন ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর ধ্বনি রুদ্ধ হয়ে যেত এবং মনে হতো যেন কান্নার ফলে হাড়ির মধ্যে টগবগে ফুটন্ত পানির শব্দের ন্যায় তাঁর বক্ষদেশে শব্দ বিরাজ করছে। তাঁর মৃত্যুর দিন তাঁর মোট সম্পদ ছিল কিছু মুদ্রা, যার একভাগ ঋণ পরিশোধ করতে, আর বাকিটা অভাবী লোকের মধ্যে বিতরণেই শেষ হয়ে যায়। যে কাপড় পরিধান করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই কাপড় ছিল বহু স্থানে তালিযুক্ত। যে গৃহ থেকে সারা বিশ্বে আলো ছড়িয়ে পড়ে, সেই গৃহ ছিল অন্ধকার। কারণ প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেল ছিল না।

**মৃত্যু পর্যন্ত অটল :** অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু মহানবী ﷺ-এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। জয়ে-পরাজয়ে, ক্ষমতায়-রিক্ততায়, প্রাচুর্যে-দারিদ্রে প্রত্যেক অবস্থাতে তিনি একই ছিলেন। তাঁর চরিত্রে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। সত্যই আল্লাহর নিয়ম ও বিধানের মতো আল্লাহর পয়গম্বরও পরিবর্তনহীন।

## চতুর্থ অধ্যায় : পুরো বিশ্বজগতের জন্য চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার

**অত্যন্ত ন্যায়বান :** প্রবাদ আছে যে, ‘একজন সৎ মানুষ আল্লাহর চমৎকার সৃষ্টি’। মুহাম্মাদ ﷺ তো ছিলেন সততার সর্বোচ্চ উদাহরণ। তাঁর অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে মানবতা বিরাজ করত। মানবপ্রেম ও সহানুভূতি তাঁর আত্মার সংগীত ছিল। মানুষের সেবা, মানুষের উত্থান, মানুষকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করা ও মানুষকে শিক্ষিত করা। এককথায় মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করাই ছিল তাঁর মিশনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই তাঁর জীবন ও মৃত্যু অর্পিত ছিল। যেমন তাঁর অদ্বিতীয় অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশক নীতিতে মানবকল্যাণ ছিল তেমনি তাঁর চিন্তা-ভাবনায়, কথায় ও কর্মে, সবকিছুতেই শুধু মানবকল্যাণ ছিল। তিনি অতি সাধারণ, সাদাসিধা ও নিঃস্বার্থ ছিলেন। কী পরিচয়ে তিনি আখ্যায়িত হতে চেয়েছেন? শুধু দুটি, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর পয়গম্বর। প্রথমে বান্দা (দাস) তার পরে পয়গম্বর ও রাসূল। তিনি সেই মতোই পয়গম্বর ও বার্তাবাহক ছিলেন, যেমন বহু পয়গম্বর ও বার্তাবাহক তাঁর পূর্বে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে অতিবাহিত হয়ে গেছেন, যাদের মধ্যে কিছুকে আমরা জানি আর অনেককে জানি না। এই নিরেট সত্য আক্বীদা ও বিশ্বাসগুলোর প্রতি যদি কোনো ব্যক্তির ঈমান ও বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। উক্ত বিষয়গুলো মূল আক্বীদা বা বিশ্বাস।

জনৈক ইউরোপীয় লেখক লিখেছেন, ‘সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর অনুগামীদের অগাধ শ্রদ্ধা দেখে বলতে পারি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো যে, তিনি কখনো অলৌকিক শক্তি দেখানোর দাবি করেননি’। তাঁর দ্বারা মু‘জিযা ও নিদর্শন সংঘটিত হয়েছে। তিনি এর কৃতিত্ব আল্লাহ পাক ও তাঁর অলৌকিক পদ্ধতিকে প্রদান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন যে, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। মুহাম্মাদ ﷺ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভাণ্ডারের মালিক ছিলেন না, আর তিনি এ কথাও বলেননি যে, তিনি অদৃশ্য বিষয়ের খবর রাখেন। যদিও যে সেই যুগে অলৌকিক ঘটনা দেখানো সাধু-সন্তদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, আর তখন পুরো বিশ্বজগৎ আরব হোক বা অনারব অদ্ভুতকাণ্ড ও অলৌকিক ঘটনার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল।

**বৈজ্ঞানিক অভিযোজন :** তিনি প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তাঁরা প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে পারেন আর আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও ওদের মধ্যে কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না’ *(আদ-দুখান, ৪৪/৩৮-৩৯)*।

কুরআনের যে আয়াতগুলোতে প্রকৃতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে, সেই আয়াতসমূহের সংখ্যা অনেক বেশি ঐ আয়াতগুলোর অপেক্ষায় যে আয়াতগুলোতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম গবেষকরা প্রকৃতির অতি নিকট থেকে

পর্যবেক্ষণ শুরু করেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার এমন সূত্রপাত ঘটান, যা গ্রীকদেরও অজানা ছিল। মুসলিম উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনে বাইতার পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এমন এক গ্রন্থ রচনা করেন যাকে মেয়ার তাঁর 'gesch der Botanika' নামক গ্রন্থে অতুলনীয় ও কঠিন পরিশ্রমের স্মৃতি বলে উল্লেখ করেন। আল-বিরুনী দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দেশে দেশে ভ্রমণ করে খনিজধাতুর নমুনা সংগ্রহ করেন।

আর কিছু মুসলিম জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ বারো বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে থাকেন, এর বিপরীত আরাস্ত একটিও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ না করেই পদার্থ বিজ্ঞানের উপর বই লেখেন এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে লিখতে গিয়ে মহা অগোছালের প্রমাণ দেন, তিনি বলেন, অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের দাঁত সংখ্যা বেশি। কিন্তু তিনি এটা প্রমাণ করার জন্য কোনো কষ্টও স্বীকার করেননি, যেহেতু এটা কোনো বড় কঠিন কাজ ছিল না।

**পশ্চিমারা বিজ্ঞানের জন্য আরবের কাছে ঋণী :** শরীর বিদ্যার মহান ব্যক্তি গ্যালেন বলেন যে, 'মানুষের চোয়ালের নিম্নভাগে দুটো হাড় থাকে এবং এই ধারণাই বহু শতাব্দী ধরে আপত্তিহীনভাবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এক মুসলিম গবেষক আব্দুল লতীফ মানুষের কঙ্কালের সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক ধারণা সম্পর্কে পৃথিবীকে অবগত করান।

Making of Humanity' গ্রন্থে নিজ মন্তব্য এই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন যে, 'বিজ্ঞান আরবদের কাছে কেবল বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার ও তত্ত্বের জন্যই ঋণী নয়, বরং বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যও আরবদের কাছে ঋণী'। তিনি আরো বলেন, তত্ত্বীয় নিয়মমালা রচনা করা গ্রীকদের অবদান কিন্তু তদন্ত করার ধৈর্য, সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা, বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোকে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে লেখা, দীর্ঘায়িত পর্যবেক্ষণ গবেষণা, পরীক্ষা-নীরিক্ষা এসবই ছিল গ্রীকদের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটাকে আমরা আজ বিজ্ঞান বলি, আর যা হচ্ছে অনুসন্ধানের নিত্য নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়ম, পরিমাপের শৃঙ্খলা এবং গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নের প্রণালী, যেগুলো আজ ইউরোপে বিকশিত হয়, তা থেকে ইউরোপ একেবারে অজ্ঞ ছিল, আরবরাই ইউরোপ জগতকে এই সব নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে পরিচয় করান'।

## 'ঘটনাবহুল আফগান শাসনের অতীত ও বর্তমান' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার হামলার পর আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনী তালেবান সরকারকে উৎখাত করে। আমেরিকান সমর্থিত হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। সেদিন থেকে তালেবান আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আমেরিকান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হামিদ কারজাই ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে সমাসীন ছিলেন। ২০১৪ সালে আশরাফ গনি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০২১ সালের ১৫ই আগস্ট আমেরিকান সৈন্যরা যুদ্ধে পরাজিত হয়। এবং তালেবানরা পুনরায় আফগানিস্তানের শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

বিশ্ববাসীর নযর এখন তাই আফগানিস্তানের দিকে। অবশ্য তারা কী করবে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। ইতোমধ্যে তারা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। তবে বিশ্ব মুসলিমের প্রত্যাশা থাকবে, তালেবান নেতারা সন্ত্রাসী তকমা থেকে বেরিয়ে আসুক! বিশ্ববাসী আমেরিকার অনুগতদের প্রাণভয়ে আফগান ছাড়ার হিড়িক দেখতে পাচ্ছে। তালেবানরাই যে তাদের প্রকৃত বন্ধু সেটা তালেবানকেই প্রমাণ করতে হবে। মক্কা বিজয়ের পর শত্রুদের সাথে নবীজির ﷺ কৃত আচরণ প্রয়োগ করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে আমেরিকানরা নয়, আমরাই তোমাদের প্রকৃত রক্ষক।

মুসলিমরা চায় না, পৃথিবীতে নতুন করে কোনো চরমপন্থী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক! তারা চায়, খোলাফায়ে রাশেদার আদলে একটি উদার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক! যেখানে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটবে। আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার জয় হবে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা হবে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র। সেখানে অনুসৃত হবে বিশ্বজনীন ইসলামের সুমহান শান্তির বার্তা। গোটা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। আর অন্তরে সেটা লালন করার সুপ্ত ইচ্ছার বিচ্ছুরণ ঘটবে।

# আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

*মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর*
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-৯)

**ভুল ধারণা-৯ : আহলেহাদীছগণ সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা দেয় :**

পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াতের বিস্তার এবং দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে কোথাও রাজনৈতিকভাবে আবার কোথাও নতুন নতুন বানোয়াট প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে ইসলামের উপর এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উস্কিয়ে দিচ্ছে। নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন মিডিয়া, ধর্মীয় মাযহাবী বিভিন্ন কনফারেন্স এবং সস্তা রাজনীতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে এই যুলুম এবং অত্যাচারমূলক কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। মাযহাবী গোঁড়ামিতে ডুবে থাকা কিছু অজ্ঞ ও মূর্খ মুসলিম এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা থেকে ফায়দা লুটার উদ্দেশ্যে এই অপবাদকে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বর্তমানে এটা একটি সহজ এবং লাভজনক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। কোনো এলাকায় কোনো আহলেহাদীছকে কুরআন এবং সুন্নাহর দাওয়াতে সফল হতে দেখলে তা প্রতিহত করার জন্য তার উপর কোনোভাবে সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাকে পুলিশের হাতে দিয়ে তার উপর সন্ত্রাসবাদের ট্যাগ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে মানুষদেরকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

**১. আহলেহাদীছগণের মতে যমীনে বিশৃঙ্খলা নিন্দনীয় বিষয় :** ইসলাম কখনো সন্ত্রসবাদের শিক্ষা দেয় না এবং আহলেহাদীছগণও এ আদর্শকে বিশ্বাস বা লালন কোনটাই করে না। সন্ত্রাসবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ‘আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৭)*। আহলেহাদীছদের মতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুধু নিন্দনীয় নয়, বরং এর প্রতি আগ্রহ রাখা কিংবা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা সবই নিন্দনীয় আমল।

**২. অমুসলিমদের প্রতি প্রশংসনীয় এবং ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা :** ইসলামের শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অবস্থান অনুসারে সুন্দর আচরণ লাভের অধিকার রাখে- এমন বিশ্বাস আহলেহাদীছগণ লালন করেন, চায় সে অমুসলিম হোক। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন’ *(আল-মুমতাহিনা, ৬০/৮)*। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তি সুন্দর আচরণ এবং ন্যায়নিষ্ঠতা হতে বঞ্চিত হতে পারে না।

**৩. আহলেহাদীছগণের মতে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম :** ইসলামে মানুষের জীবনের (চায় সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম হোক) গুরুত্ব বা মূল্য কত? একথা বুঝার জন্য নিম্নের আয়াতই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ‘এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই রক্ষা করে...’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩২)*।

কুরআনের উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষকে হত্যা করার অর্থ সমস্ত মানুষকে হত্যা করা আর একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা মানে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করা।

**৪. আহলেহাদীছগণের মতে কাফেরদের উপরও অত্যাচার করা বৈধ নয় :** জীবনের মর্যাদা এবং মূল্য এতই বেশি যে, কোনো ব্যক্তির জীবননাশ তো দূরের কথা, কোনো অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার কিংবা অসৌজন্যমূলক আচরণও ইসলামে নিষিদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মুসলিম হওয়া তাকে এই অধিকার দেয় না যে, সে কোনো অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করবে।

**(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৩ নং পৃষ্ঠায়)**

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।



www.al-itisam.com

# একটি লিফলেটের ইলমী জবাব

-আহমাদুল্লাহ*

(সেপ্টেম্বর'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

**(৬) পায়ে পা না লাগিয়ে কাঁধের সাথে কাঁধ লাগিয়ে কাতার সোজা করা :**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করো। মাঝের খালি জায়গা পূরণ করো এবং অপর ভাইয়ের সঙ্গে নমনীয় আচরণ করো। শয়তানের জন্যে মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা রেখে দিওনা (আবূ দাঊদ হা/৬৬৬)।

**জবাব :** এ হাদীছটি ছহীহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ হাদীছ দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, পায়ের সাথে পা লাগাতে হবে। কেননা মাঝের খালি জায়গা পূরণ হবে কীভাবে যদি পায়ের সাথে পা না মিলে? শয়তানের জন্য মাঝখানে ফাঁকা জায়গা তখনই বন্ধ হবে, যখন মুছল্লীরা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবে। যতই কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো হোক না কেন নিচের দিকে উভয় মুছল্লীর মাঝে ফাঁকা থাকবেই। অথচ উপরিউক্ত হাদীছে ফাঁকা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যতীত আরও কিছু হাদীছ রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

(১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনের মাঝে ফাঁকা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা উভয়ের মাঝে ফাঁকা রাখলে শয়তান তাতে প্রবেশ করে।[১]

(২) নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে আছে যে, ছাহাবীগণ কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং ও গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে ছালাত আদায় করতেন।[২]

সুতরাং মুফতী সাহেবের পেশকৃত হাদীছ ও পরের দুটি হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাব টাখনুর সাথে টাখনু মিলানোর দলীল পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে উভয়ের মাঝে কোনোভাবেই ফাঁকা রাখে না। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়াও এতে শয়তানকে প্রবেশের জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়।

**(৭) মাগরিবের পূর্বে কোনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব ছালাত নেই :**

এ শিরোনামে একটি হাদীছ আনা হয়েছে। যেমন—

عَنْ ابِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.

হযরত আবু বুরদাহ রা. বলেন, নবীজি সা. ইরশাদ করেছেন, মাগরীব ছাড়া প্রতি ওয়াক্তের আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাকাত নামায রয়েছে' (সুনানে দারাকুতনী হাদীস নং-১০৪০)।

**জবাব :** ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

رَوَاهُ حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ وَأَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ وَأَتَى بِزِيَادَةٍ لَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهَا.

'হাদীছটি হাইয়ান ইবনু উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা হতে। তিনি সনদে ভুল করেছেন। তিনি যে বর্ধিতাংশটুকু (মাগরিব ব্যতীত অংশটুকু) এনেছেন, তার সমর্থক কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না'।[৩]

**মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাকআত নফল ছালাত আদায়ের দলীলসমূহ :** এ ব্যাপারে অনেকগুলো ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন—

**হাদীছ—১ :**

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল হতে বর্ণিত যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে। এটি তিনি তিন বার বলার পর বললেন, যার মন চায় সে পড়বে'।[৪] এটি ছহীহ বুখারীর হাদীছ। এর বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নই আসে না।

**হাদীছ—২ :**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আদেশ করে বলেছেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে ছালাত আদায় করো'। রাবী বলেন,

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. আবূ দাঊদ, হা/৬৬৭, হাদীছ ছহীহ।

২. আবূ দাঊদ, হা/৬৬২; ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫, আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে।

৩. বায়হাক্বী কুবরা, হা/৪১৭১-৭২।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪।



www.al-itisam.com

‘তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার মন চায় সে পড়বে’। এ ভয়ে তিনি বললেন, যেন লোকেরা একে সুন্নাত (অপরিহার্য রীতি)[৫] মনে না করে’।[৬]

**হাদীছ—৩ :**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمغْرِبِ.

আনাস ইবনু মালেক হতে বর্ণিত, মুয়াযযিন যখন আযান দিতেন তখন নবী ﷺ-এর ছাহাবীদের মধ্যে অনেকেই তড়িঘড়ি করে মসজিদের খুঁটির কাছে ছুটে যেতেন এবং নবী ﷺ-এর বের হওয়ার আগ পর্যন্ত মাগরিবের পূর্বে দু’রাকআত ছালাত আদায় করতেন।[৭]

**হাদীছ—৪ :**

عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

আব্দুল্লাহ মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু’রাকআত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর তিনি বললেন, ‘যার মন চায় সে মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু’রাকআত ছালাত পড়বে’। লোকেরা যেন একে সুন্নাত (অপরিহার্য রীতি) মনে না করে সে আশঙ্কায় তিনি এমনটি বলেছিলেন।[৮]

**হাদীছ—৫ :**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল ﷺ-এর যামানায় মাগরিবের ছালাতের আগে দু’রাকআত ছালাত আদায় করতাম’। রাবী বলেন, ‘আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে দেখেছেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোনো আদেশ-নিষেধ করেননি’।[৯]

এ হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু’রাকআত ছালাত আদায় করার বিষয়টি সুস্পষ্ট ছহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে পড়ার না পড়ার বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন। যার মন চায় পড়বে। আর যার মন চায় না পড়বে না। কেউ যদি আদায় করে তাতে তার ছওয়াব রয়েছে এবং তা উত্তম। আর কেউ ছেড়ে দিলে তাতে তার কোনো প্রকারের গুনাহ হবে না। সুতরাং মানুষকে আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান না করে তার বিরোধিতা করা হাস্যকর।

*(চলবে)*

৫. হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ‘সুন্নাত’ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَمَعْنَى قَوْلِهِ سُنَّةً أَيْ شَرِيعَةً وَطَرِيقَةً لَازِمَةً অর্থাৎ ‘শরীআত ও অপরিহার্য রীতি’ (ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠা)।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৩।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৫।

৮. আবূ দাঊদ, হা/১২৮১, হাদীছ ছহীহ।

৯. আবূ দাঊদ, হা/১২৮২, হাদীছ ছহীহ।

## ‘আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, اتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا رَادٌّ وَلَا حِجَابٌ ‘মাযলূমের ফরীয়াদ (বদদু‘আ) থেকে বেঁচে থাকো, যদিও সে কাফের হয়। কেননা মাযলূমের বদদু‘আ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই’*(মুসনাদে আহমাদ, ছহীহুল জামে‘, হা/১১৯, হাদীছ হাসান)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যুলুম যার সাথেই করা হোক না কেন, তা যুলুম হিসেবেই গণ্য হবে, এমনকি সে অমুসলিম হলেও। অমুসলিমের উপর অত্যাচার করার কারণে একজন মুসলিমও আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে বাস্তব শিক্ষা ও আদর্শ আলোচিত হয়েছে, আহলেহাদীছগণ তারই ধারক ও বাহক। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, প্রত্যক ধর্ম, ত্বরীকা ও মাযহাবের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে, যারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নষ্ট করে। সুতরাং কোনো এক ব্যক্তির কারণে পুরো দল বা গোষ্ঠীকে উশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আখ্যা দেওয়া ন্যায়পরায়ণতা পরিপন্থী কাজ। আবার ব্যক্তি বিশেষের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পুরো জামাআতকে অপরাধী বানানো ঐরূপ, যেমন কোনো একজন ব্যক্তির ভুলের কারণে তার পুরো পরিবারকে দায়ী বা অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদেরকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো, যদিও ঐ পরিবারের সদস্যগণ তার আচরণের সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করে। আর এটাই যুলুম, অন্যায় ও অপবাদের নিকৃষ্ট রূপ। নবী করীম ﷺ বলেছেন, إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَجَا رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا ‘নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে’*(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, আল-আদাবুল মুফরাদ, ছহীহুল জামে‘, হা/১৫৬৯, হাদীছ ছহীহ)*।

*(চলবে)*



www.al-itisam.com

# রসিকতা হোক পরিমিত

*-উছমান ইবনে আব্দুল আলীম**

মানুষের মনকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন আনন্দময় জীবন। আর আনন্দময় জীবনের জন্য প্রয়োজন হাস্য-রসিকতা। জ্ঞানীরা বলেন, আনন্দ ও চিত্ত-বিনোদন মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়তে সহায়তা করে। পার্থিব জীবনকে করে সফল ও স্বার্থক।

আজকাল মনোবিজ্ঞানীরাও মানুষের সুস্থতার জন্য আনন্দ ও চিত্ত-বিনোদনকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে এটা যে কোনো ব্যক্তির সাথে হতে পারে; ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ যে কোনো ব্যক্তির সাথে। একজনের হাস্যোজ্জ্বল বা রসিকতাপূর্ণ চেহারায় অন্য একজনের গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারাও আনন্দময় হয়ে ওঠে। এককথায় একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার জন্য রসিকতার প্রয়োজনীয়তা অন্যরকম। এ রসিকতা করতে কোনো বাধা নেই। অন্তত স্বভাবধর্ম ইসলাম মানব প্রকৃতির এ প্রবণতায় বাধ সাধে না। তবে হ্যাঁ, ইসলাম যেহেতু ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম এবং সর্বক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের চর্চা ও মাত্রাজ্ঞানের তা'লীম তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই এক্ষেত্রেও তার শিক্ষা হলো, রঙ্গ-রসিকতার অনুমোদন আছে ঠিকই, কিন্তু সাবধান! মাত্রা অতিক্রম করা যাবে না। সীমার মধ্যে থেকে সবকিছু করতে হবে। অর্থাৎ রসিকতার অনুমতিও দেওয়া, ক্ষেত্র বিশেষে উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে, তবে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে হবে।

রসিকতা যে ইসলামে অনুমোদিত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রিয় নবী ﷺ নিজেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো রসিকতা করতেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহে এর একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন- আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য একটি বাহনের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে বাহন হিসেবে উটনীর একটি বাচ্চা দেব। লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কী করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরে উট কী উটের বাচ্চা ছাড়া অন্য কিছু প্রসাব করে!?[১]

প্রিয় নবী ﷺ-এর এ জাতীয় রসিকতার ঘটনা আরও আছে। একটা ঘটনা বড় চমৎকার, যা না বললে নয়। সেটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাহির নামক এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রামের বিভিন্ন জিনিস নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিতেন। নবী ﷺ ও তাকে শহরের বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বিদায় করতেন। তিনি বলতেন, যাহির হলো আমাদের গ্রাম আর আমরা তার নগর। তিনি তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তো একদিনের কথা, যাহির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাজারে তার পণ্য বিক্রি করছিলেন। এ অবস্থায় প্রিয় নবী ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি পেছন দিক থেকে প্রিয় ছাহাবীকে জড়িয়ে ধরলেন। যাহির তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি (বিরক্ত হয়ে) বলে উঠলেন, কে তুমি? আমাকে ছেড়ে দাও। তারপর পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। প্রিয় নবী ﷺ-এর এ রসিকতা তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসার কত বড় যে ঝড় তুলেছিল, তা সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং সে ঝড়ের কবলে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। কাল বিলম্ব না করে নিজেকে আরও পেছন দিকে নিয়ে যেতে থাকলেন। এভাবে একদম সেঁটে গেলেন পরম প্রিয়জনের বুকের সাথে। নবীজীও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। তারপর রসিকতার মাত্রা যোগ করে বললেন, কে কিনবে? এই গোলামটি বিক্রি করব। যাহির দেখতে সুশ্রী ছিলেন না। বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দাম সস্তা হবে। আমাকে কেউ কিনতে চাইবে না। প্রিয় নবী ﷺ (সান্ত্বনা দিয়ে আসল কথাটিই) বলে ফেললেন, কিন্তু আল্লাহর কাছে তুমি সস্তা নও। তাঁর কাছে তোমার দাম অনেক।[২] অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক বৃদ্ধা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাত দান করেন। তখন রাসূল ﷺ (রসিকতা করে) বলেন, 'হে অমুকের মা! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল ﷺ ছাহাবীদের বললেন, তাকে গিয়ে বলো, বরং সে যুবতী ও চিরকুমারী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

---

* মুহাদ্দিছ, দারুল উলূম মোহাম্মদপুর কওমি মাদ্রাসা, চাটমোহর, পাবনা।

১. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯৮, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

২. শামায়েলে তিরমিযী, হা/২৩০, হাদীছটি ছহীহ।

৩. শামায়েলে তিরমিযী, হা/২৪১, হাদীছটি হাসান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও রসিকতা করতেন, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে, কিন্তু তার রসিকতায় মিথ্যার কোনো ছোঁয়া থাকত না। একবার তো ছাহাবায়ে কেরাম প্রশ্নই করে বসলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে আমাদের সাথে রসিকতা করেন অথচ এক হাদীছে আপনি আমাদের এটা করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি (রসিকতাচ্ছলেও মিথ্যা বলি না)। কেবল সত্যই বলি।[৪] তাঁর প্রতিটি রসিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁর প্রতিটি রসিকতাই সত্য নির্ভর; সেখানে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। যেমন- একবার তিনি আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলেছিলেন, ‘ওহে দুই কানওয়ালা’![৫]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সমাজে এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা এই রসিকতার ছলে বহু মিথ্যা বা কাল্পনিক কথা বলে ফেলে, যা কখনো একজন মুমিনের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, ‘মিথ্যানির্ভর ইচ্ছা বা কৌতুক কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়’।[৬] অন্য এক রেওয়ায়েতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মানুষকে হাসানোর জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস’।[৭] অর্থাৎ এই মিথ্যা তাকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। হাদীছে এসেছে, ‘তোমরা মিথ্যা পরিহার করো। কেননা মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে আর পাপ মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়’।[৮]

আবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে অনেক সময় ছোট শিশুদের সঙ্গেও মজা করতে দেখা যায়। যেমন- আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, মহানবী ﷺ আমাদের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে কৌতুক করে বলতেন, ‘হে আবূ উমায়ের! তোমার নোগায়েরের কী হয়েছে? অর্থাৎ তোমার নুগায়ের পাখিটার কী অবস্থা? খেলার পাখিটা মারা গেলে আবূ উমায়ের অনেক কষ্ট পান। তাই রাসূল ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাখিটির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এভাবে রাসূল ﷺ এর তার সঙ্গে কথা বলার কারণে তার দুঃখ দূর হয়, সে আনন্দ পায়।[৯]

তবে শিশুদের সঙ্গে রসিকতা করতে হলে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। এমন কোনো রসিকতা করা যাবে না, যার দ্বারা তারা ভুল শিক্ষা পায়। রসিকতা করে শিশুদের ডাকার সময় আমাদের অনেকে বিভিন্ন জিনিস (চকলেট, কলা ইত্যাদি) দেওয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে সেটা তাকে দেওয়া হয় না, যা সুস্পষ্ট ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় প্রলোভন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রথমত ধোঁকার কারণে এতে গুনাহ হয়, দ্বিতীয়ত শিশুটি অনৈতিক শিক্ষা পায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে (কিছু দেওয়ার জন্য) ডাকল, এদিকে এসো! অতঃপর তাকে তা দিল না, তবে তা মিথ্যা’।[১০] তাই হাসি-মস্কারা বা রসিকতা হতে হবে সম্পূর্ণ সত্যনির্ভর এবং ধোঁকামুক্ত।

আবার হাস্যরসাত্মক কিছু বলতে বা লিখতে গিয়ে অনেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির ট্রল করে বসে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হাসির ছলে নবী ﷺ-কে জনৈক ব্যক্তির চালচলন নকল করে দেখালেন। রাসূল ﷺ তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন।[১১] এর দ্বারা বুঝা যায়, রসিকতার অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে, তবে অবশ্যই তা যেন নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকে; কোন অবস্থাতেই এমনটি যেন না হয়, যাতে করে সেখানে মিথ্যার মিশ্রণ ঘাটে অথবা কোন ব্যক্তি বা বিশেষ কোন গোষ্ঠী কষ্ট পায়।

মোটকথা, রসিকতাকে অবশ্যই সব ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মুক্ত হতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শব্দচয়ন, বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং উপস্থাপনা শালীন ও মার্জিত হতে হবে। স্বার্থক ও কল্যাণকর রসিকতা চর্চার জন্য সতর্কতা ও সচেতনতার বিকল্প কোনো কিছু নেই।

মনে রাখতে হবে, রসিকতার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারা ব্যক্তির ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ এবং উন্নত রুচিশীলতার পরিচায়ক। অন্যথা এরকম ইসলাম অনুমোদিত সুন্দর একটি বিনোদন ব্যবস্থা যেকোন মানুষের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে বুঝার ও আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. জামে‘ তিরমিযী, হা/১৯৯০, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৫. শামায়েলে তিরমিযী, হা/২৩৫, হাদীছটি ছহীহ।
৬. সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৪৬, হাদীছটি ছহীহ।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯০, আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
৮. সুনানে তিরমিযী, হা/১৯৭১, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫০; শামায়েলে তিরমিযী, হা/২২৮।
১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৮৩৬।
১১. তিরমিযী, হা/২৫০২, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

# মুঠোফোন প্রযুক্তি : অপূরণীয় ক্ষতি

-মীযান মুহাম্মাদ হাসান*

দুই বছরের শিশু থেকে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ, অশিক্ষিত কী মূর্খ, আলেম কী জাহেল— কেউ আমরা বাদ নেই এ যন্ত্রের রকমারি ব্যবহার থেকে! শিক্ষার নামে, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা ও উন্নয়নের নামে, তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র গঠনের সৎ চিন্তা চেতনা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশায়!

কিন্তু শিক্ষার্থীদের জন্য আজ এটি একটি জীবনবিধ্বংসী মরণব্যাধির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে মরণব্যাধি ক্যানসার বা করোনা ভাইরাস বললেও ভুল হবে না! দীর্ঘ এক বছরের করোনাকালীন লকডাউনে মুঠোফোন শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবজীবন ও যৌবনকে ঠেলে দিচ্ছে ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

অনেকে শুধু পড়ালেখার নাম করেই এই মৌসুমে ১০-১৫ হাজার টাকা এর পিছনে ব্যয় করেছেন। অথচ করোনাকালে অর্থনৈতিক মন্দার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও আন্দাজ সকলের হয়েছে নিশ্চয়ই! অনলাইনে পাঠদানের আয়োজন হবে। তাই মুঠোফোন প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে। আপডেট হতে হবে ইত্যাদি।

তবে সচেতনমহলের অনেকে আবার বলছেন— অনলাইনে পাঠদানের আয়োজন, না পয়সার ধান্দা! যা-ই হোক। ক্ষতি যা হবার তাই হয়েছে।

আমরা বড়রা কিংবা অভিভাবক বা আপনজন সময় পাস করতে, বিনোদন বা ঠুনকো কারণবশতই শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছি এই মুঠোফোন। সে হয়তো ইউটিউবে কার্টুন দেখছে, নয়তো অন্য কিছু। এভাবেই তার সাইকোলজির পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। একসময় সে নেট আসক্তির চরম সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর না আছে তার টাইমলি পড়ালেখা; না আছে বিশ্রাম ঘুম নাওয়া খাওয়া।

বিশ্বের অন্যতম ধনী বিল গেটসের নাম শুনেননি এমন মানুষ কমই আছে সমাজে। তিনি তার সন্তানকে ১৪ বছর বয়সের আগে কোনো মুঠোফোন দেননি। অথচ তার কি টাকা-পয়সার অভাব ছিল কোনো? কেন তিনি তার সন্তানকে মুঠোফোন দেননি? বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আমাদের মতো হুজুগে বাঙালী নয়। একজন নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, '১৬ বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে মুঠোফোন না দেওয়া উচিত'। তবে আমরা কী করছি, ভেবেছি একটিবারের জন্য? আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন দিব্যি নেট ব্যবহার করে। ফেসবুক, ইউটিউব আরও কত কী! এগুলো এক একটি নেশার মতো। শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল এর মতে, 'ড্রাগ আর ফেসবুকে কোনো পার্থক্য নেই'। তবে কল্পনা করা যায় কী হবে আমাদের তরুণপ্রজন্মের?

এজন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল' *(আর-রূম, ৩০/৪১)*।

আজ আমরা নিজ হাতে আমাদের সন্তানের হাতে দামি মুঠোফোন তুলে দিচ্ছি। এর ফলে যে সমূহ ক্ষতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কোনো প্রতিকার বা বিকল্প কি আছে আমাদের?

তাই বেকার তরুণ-তরুণী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী হবে? যাদের এখন কোনো কাজ নেই। অভিভাবকরা আদরে-আহ্লাদে তাই এদের হাতে তুলে দিয়েছি— মুঠোফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ জাতীয় নানা রকম ডিভাইস।

ভার্চুয়াল আবিষ্কার ও আবির্ভাবে মানব সমাজের মনুষ্যত্ব কী পরিমাণ লোপ পেয়েছে, তা বলবার ভাষা থাকলেও সাহস নেই। এসব প্রযুক্তির বিরুদ্ধে বলছি না। আবার এসব ছেড়ে দিতে হবে কিংবা বাদ দিতে বলব, তাও না; বরং বলতে চাইছি যে, এই প্রযুক্তিই আমাদের পারস্পরিক অশ্রদ্ধাবোধ ও অভক্তির কারণ হয়েছে। বেড়ে গেছে ক্রাইম, অন্যায়-অনাচার, মহামারি। শিশু-কিশোর, তরুণ প্রজন্মকে করে তুলেছে বেয়াদব-বেপরোয়া। তুলনামূলক শিক্ষিত ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর মানুষের চেয়ে অশিক্ষিত বিজ্ঞানবিমুখ সেকেলে টাইপের মানুষের মাঝেই এখনো রয়ে গেছে অনাবিল আনন্দ, সুখ ও শান্তি। আছে দুঃখ-বেদনা-কষ্ট ভাগাভাগি করে নেবার সহজাত মানসিকতা। তবে আমরাই আধুনিক আপডেট হতে হতে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছি দিন দিন। ডিশ এন্টেনার চেয়ে হালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে এখন আধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত এই মুঠোফোন! সুতরাং আমাদের এখনই সচেতন হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

* সাবেক খত্বীব, বৈরাগীরচালা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

# প্রশংসনীয় চরিত্র

*[১০ ছফর, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১। পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন* ***শায়খ ড. বান্দার ইবনে আব্দুল আযীয বালীলাহ*** *হাফিযাহুল্লাহ। বাংলা ভাষায় উক্ত খুৎবার ভাবানুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক* ***শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

## প্রথম খুৎবা

সম্মানিত খত্বীব খুৎবার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসায় বলেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, প্রশংসা মাত্রই তোমার নেয়ামত কেন্দ্রিক। কৃতজ্ঞতা একমাত্র তোমারই, কেননা কৃতজ্ঞতা কেবল তোমারই নেয়ামত বৃদ্ধি করে। তোমার জন্যই অনুগ্রহ, দয়া, দান, শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব। হে আমাদের রব! তোমার চেয়ে উচ্চ ও মর্যাদাবান কোনো জিনিস নেই। তুমি সবকিছুর অধিপতি, তত্ত্বাবধায়ক ও আসমানের আরশে সমুন্নত। তাঁর সম্মানে চেহারা অবনমিত হয় ও সিজদা করে। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবী ও যারা তাঁর অনুসরণ করে ও সত্য পথে চলে তাদের প্রতি।

**অতঃপর, হে মানবমণ্ডলী!** আমি আপনাদের সকলকে ও নিজেকে তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ দান করবেন। আর তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন যা দিয়ে তোমরা পথ চলবে। আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৮)*।

**হে ঈমানদারগণ!** ইসলাম হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সুন্দর শিষ্টাচার এবং সভ্যতা ও আভিজাত্যের ধর্ম।

এটা এমন দ্বীন, যা মহৎ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত ও আবশ্যক করে এবং এর উপরই তার অনুসারীদের গড়ে তোলে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ সালাফদের মানহাজ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা উত্তম চরিত্র ও ভালো আমলের দিকে দাওয়াত দেন। আর তারা রাসূল ﷺ-এর বাণী,أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'ঈমানের বিচারে ঐ মুমিন পরিপূর্ণ যার চরিত্র সুন্দর'[১]-এর মর্মার্থকে বিশ্বাস করে। আর নবী করীম ﷺ নিজের নবুঅতপ্রাপ্তিকে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা প্রদানের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেন,إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 'সৎ চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি'।[২]

মহান আল্লাহ তার প্রশংসা করে বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)*। রাসূল ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'স্বয়ং কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র'।[৩]

**হে আল্লাহর বান্দাগণ!** মহৎ চরিত্রের অগ্রভাগে রয়েছে প্রশংসনীয় একটি গুণ, যা মহত্ব ও কল্যাণ দান করে এবং ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর তা হচ্ছে 'ইনছাফ'। আদল ও ইনছাফ বা ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার হলো কোনো জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখা এবং অন্যকে তার হক্ব বা অধিকার ঐভাবে প্রদান করা, যেভাবে সে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করতে ভালোবাসে। ন্যায়-ইনছাফের প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়ে শরীআতের দলীল এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকো, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে, তোমরা ইনছাফ করা ত্যাগ করবে। সুবিচার করো, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত' *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন' *(আন-নাহল, ১৬/৯০)*। আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ '(তুমি বলো,) তোমাদের মাঝে ইনছাফ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি' *(আশ-শূরা, ৪২/১৫)*।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮২, হাসান ছহীহ।
২. আহমাদ, হা/৮৯৫২, হাদীছ ছহীহ।
৩. আহমাদ, হা/২৫৮১৩, হাদীছ ছহীহ।



www.al-itisam.com

আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে— ১. নিজ থেকে ইনছাফ করা, ২. বিশ্বে সালামের প্রচার করা এবং ৩. অভাবী অবস্থাতেও দান করা।[৪] আবূয যিনাদ বলেন, কোনো বান্দা যখন ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত হয়, তখন সে তার মালিকের হক্ব আদায় না করে থাকতে পারে না আর যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত না থেকে পারে না। আর এভাবেই সে ঈমানের রুকনগুলোর সমাবেশ নিজের মধ্যে ঘটায়।

**হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ!** ইনছাফ বা ন্যায়পরায়ণাতার কতগুলো স্তর রয়েছে :

**প্রথম ও উত্তম স্তর :** মহান আল্লাহর ব্যাপারে ইনছাফ করা। ইবাদতকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করাই হলো তাঁর ব্যাপারে ইনছাফ করা। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। কারণ, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা হলো ইনছাফের বিপরীত। আর এটা নিকৃষ্টতর যুলম। মহান আল্লাহ বলেন,﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ‘শিরক অবশ্যই বড় যুলম *(লুক্বমান, ৩১/১৩)*। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন, ‘আল্লাহর জন্য অংশীদার স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’।[৫]

**দ্বিতীয় স্তর :** নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ইনছাফ করা। আর তা হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে মুহাব্বত করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথা ও আদেশকে সকলের কথা ও আদেশের উপর প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

**তৃতীয় স্তর : হে আল্লাহর বান্দাগণ!** ব্যক্তির নিজের আত্মার সাথে ইনছাফ করা। আর এটি হলো সর্বোচ্চ স্তর। যে নিজের আত্মার সাথে ইনছাফ করতে সক্ষম নয়, সে অন্যের সাথে ইনছাফ করতে পারে না। কেননা যে আদর্শ দাতার মধ্যে নেই, তা সে দিতে পারে না। ব্যক্তি তার আত্মার সাথে ইনছাফ করার অর্থ হলো আত্মার নিকট এমন কোন জিনিসের দাবি না করা যা তার নিকট নেই। নিচু চরিত্র ও অবাধ্যাচরণে লিপ্ত হয়ে আত্মাকে অপবিত্র বা কলুষিত করবেন না; বরং আল্লাহর আনুগত্য, ভালোবাসা, ভয়, সন্তুষ্টি, তাঁর উপর ভরসা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, অন্যের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য প্রদান এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আত্মার মান উন্নয়ন করবেন।

**চতুর্থ স্তর :** মানুষের সাথে ইনছাফ করা। একজন মুসলিমের উচিত, নিজের তুলনায় অন্যের প্রতি বেশি ইনছাফ করা। তার (মুসলিম ভাই) নিকট থেকে যে কথা শুনেছে বা তার সম্পর্কে যে বাণী তার নিকট পৌঁছেছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করা তার প্রতি ইনছাফ। মহান আল্লাহ বলেন,﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে নাও, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না ফেল। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত না হও’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)*। মহান আল্লাহ বলেন,﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে যাত্রা কর, তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নাও। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে তাকে ‘তুমি মুমিন নও’ বলো না, *(আন-নিসা, ৪/৯৪)*। একজন মুসলিম অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রেখে ও তার কথাকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে তাঁর প্রতি ইনছাফ করবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ভালো চরিত্রের পথনির্দেশ করো, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের পথনির্দেশ করতে পারে না। তুমি আমাদের থেকে মন্দ চরিত্র দূর করে দাও। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাদের থেকে মন্দ চরিত্র দূর করতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে বরকত দান করো। আর তাতে যে পথনির্দেশনা ও বিবরণ রয়েছে, তা দ্বারা আমাদের উপকৃত কর। আর আমি নিজের, আপনাদের ও সকল মুসলিমের জন্য সকল প্রকার গুনাহ ও পাপ হতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নিশ্চয় তিনি তাওবাকারীদের জন্য বড় ক্ষমাশীল।

## দ্বিতীয় খুৎবা

সম্মানিত খত্বীব দ্বিতীয় খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, তার পরিবার, ছাহাবী এবং যারা তার পথে চলে, তাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করেন। এরপর বলেন, **হে আল্লাহর বান্দাগণ!** নিশ্চয় যে জাতি অগ্রগতি ও উন্নতি সন্ধান করে, সে জাতির সন্তানদের আত্মাগুলো প্রশংসনীয় গুণাবলির এবং মহান চরিত্রের তৃপ্তিদায়ক ও পরিচ্ছন্ন পাথেয় এর প্রয়োজনবোধ করছে। যেমন তাদের শরীর ও দেহগুলো উত্তম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রয়োজনবোধ করে, যাতে করে শরীর তা থেকে জীবন ধারণের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তদ্রূপ ইনছাফও খাদ্যের ন্যায়, যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয় বা যা পরিহার করা যায় না।

**(‘হারামাইনের মিম্বার থেকে’-এর বাকী অংশ ২১ নং পৃষ্ঠায়)**

৪. ছহীহ বুখারী, ১/৫৬, ‘ঈমান’ অধ্যায়, মু'আল্লাক্ব।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৭; মুসলিম হা/৮৬।



www.al-itisam.com

# সন্ত্রাস নির্মূলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

শুআইব বিন আহমাদ*

## ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম সমস্যা হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে বিশ্বসভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সন্ত্রাস আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সন্ত্রাস একটি প্রাচীন সমস্যা হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ একবিংশ শতাব্দীতে এটি পুনরায় নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। সন্ত্রাস একদিকে যেমন বিশ্বশান্তিকে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়েছে, অপরদিকে বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

## সন্ত্রাস পরিচিতি :

**আভিধানিক অর্থ :** সন্ত্রাস শব্দটি আমরা বিশ্লেষণ করলে পাই সম+ত্রাস। ত্রাস শব্দের অর্থ— ভয়, ভীতি, শঙ্কা ইত্যাদি।[১] আর সন্ত্রাস শব্দের অর্থ হলো— মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়,[২] অতিশয় ত্রাস, ভয়ের পরিবেশ, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৩] সন্ত্রাসের আরবী প্রতিশব্দ 'আল-ইরহাব'।[৪] আল-ইরহাব মানে কাউকে ভয় দেখানো। কুরআনে কারীমে ভয় অর্থে এই শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তবে আধুনিক আরবী ভাষায় সন্ত্রাস বুঝাতে 'আল-ইরহাব' শব্দ ব্যবহার করা হলেও প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য 'আল-ইরহাব শব্দের ব্যবহার কুরআনে পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বুঝাতে আল-কুরআনে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় *(আল-বাক্বারা, ২/২১৭; আল-ফাজর, ৮৯/১১-১২)*। সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Terror, Extreme fear— প্রচণ্ড ভীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি। আর Terrorist অর্থ সন্ত্রাসী। Terrorize হলো সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৫]

**পারিভাষিক অর্থ :** পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হলো— যে কোনো স্বার্থ হাছিল করার জন্য খুন, হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি ত্রাসজনক পথ চয়ন করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে নিজের আয়ত্তে নেওয়ার নীতি অবলম্বন করা।[৬]

(ক) যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী বলেন, 'আল-ইরহাব' (সন্ত্রাস) এমন একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ, বিভিন্ন আঙ্গিকে যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো অন্যায়ভাবে নিরপরাধ, নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধ্বী নারীর সম্মানহানি করা, মুসলিমজাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা বা একতা বিনষ্ট করা।[৭]

(খ) ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ স্বীকৃত সংজ্ঞা- 'অসৎ ও অশুভ উদ্দেশ্যে সংঘটিত প্রত্যেক অপরাধমূলক কাজ তা যেখানে যার মাধ্যমে হোক না কেন তা অবশ্যই নিন্দা, তিরস্কার ও ভর্ৎসনাযোগ্য'।[৮]

(গ) The New Encyclopedia Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে, Terrorism : the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. অর্থাৎ 'একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সাধারণ জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পন্থাই হলো সন্ত্রাসবাদ'।[৯]

(ঘ) মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা F.B.I. এর মতে, Terrorism is the unlawful use of force or violence against person of property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment there of in furtherance of political or

---

* শিক্ষার্থী, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

১. ড. এনামুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৫৭৩।

২. বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (প্রকাশিত : ১৯৯৬), পৃ. ৫৪১।

৩. রিয়াজ আহমদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ (ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৮), পৃ. ২৬২।

৪. আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত 'আল মানার' বাংলা আরবী অভিধান (ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০), পৃ. ১২৮২।

৫. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ, ১৯৯৮), পৃ. ৬৬১।

৬. বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৪১।

৭. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাদী আল-মাদখালী, আল-ইরহাব ওয়া আছারু আলাল আফরাদ ওয়াল উমাম (দাম্মাম : দারু সাবীলিল মুমিনীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ১০।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৯. The New Encyclopaedia Britannica, (U.S.A.-2002), p. 650.



www.al-itisam.com

social objectives. অর্থাৎ ‘সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো সরকার, বেসরকারি জনগণ বা অন্য যে কোনো অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ করাকেই সন্ত্রাস বলা হয়’।[১০]

মোটকথা, যে সকল কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ভয়, ভীতি, ত্রাস, আতঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করে এবং জান ও মালের ক্ষতি করে, সেটাই হলো সন্ত্রাসীকার্যক্রম বা সন্ত্রাসবাদ। আর যে বা যারা এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, তারাই হলো সন্ত্রাসী।

## সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল-কুরআনের নির্দেশনা :

(ক) নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস পৃথিবীতে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। অথচ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকো। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৫৬)*।

(খ) মানবজীবন মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র। ইসলামে মানবহত্যা জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, ﴿مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ ‘যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার কিংবা ভূপৃষ্ঠে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কোনো একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করল’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩২)*।

(গ) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জঘন্যতম যে পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তা হলো আত্মঘাতী হামলা। অথচ মহান আল্লাহ নিজের জীবন ধ্বংস করাকেও চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ‘তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ‘তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু’ *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

## সন্ত্রাস প্রতিরোধে হাদীছের নির্দেশনা :

(ক) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা সম্বন্ধে রাসূল ﷺ অত্যন্ত কঠোর ঘোষণা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ‘একজন মুসলিমকে হত্যা করার তুলনায় সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবশ্যই আল্লাহর নিকট অধিক তুচ্ছ ও নগণ্য’।[১১]

(খ) একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا ‘হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার জন্য অত্যাচার হারাম করেছি এবং তা তোমাদের উপরও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না’।[১২]

(গ) বিদায় হজ্জের সময় সোয়া লক্ষ মানুষের সামনে রাসূল ﷺ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, একজনের রক্ত, সম্পদ, সম্মানহানি করা অপরজনের জন্য হারাম। তিনি বলেন, اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا ‘জেনে রেখো! নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ পবিত্র যেরূপ এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য পবিত্র’।[১৩]

মক্কা বিজয়ের পর যখন কাফের-মুশরিকদের দল ঘরের দরজা বন্ধ করে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল আর ভাবছিল যে, আমরা তো রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য তার কাঁধে কাপড় বেঁধে হ্যাঁচকা টান দিয়েছিলাম, তার পিঠে উটের পচা

১০. ফোরকান আলী, সন্ত্রাসবাদ, ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার (দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ জুন ২০০৭), পৃ. ১৪।

১১. তিরমিযী, হা/১৩৯৫, ছহীহ।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৭।

১৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৮০৮।



www.al-itisam.com

নাড়িভুঁড়ি চাপিয়েছিলাম, তাকে কতভাবেই না কষ্ট দিয়েছিলাম, বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু, খাব্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু প্রমুখ ছাহাবাকে কতই না কষ্ট দিয়েছি, মনে হয় আজ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গণহারে হত্যা করবেন। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিলেন।

উক্ত ঘটনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নয়, বরং ক্ষমা করাকেই অধিক পছন্দ করে। এছাড়াও কয়েক শতাব্দী মুসলিমগণ ভারত উপমহাদেশ শাসন করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোনোদিন কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করায় হত্যা করা হয়েছে বা তাদের কোনো মন্দির বা প্যাগোডা ভেঙে মাসজিদ বানানো হয়েছে— এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলাম যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সাপোর্ট করত, তাহলে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না।

হিন্দুস্থানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই প্রমাণ করে, ইসলাম শান্তির ধর্ম।

**উপসংহার :**

আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা বুঝা যায়, ইসলাম হলো শান্তি, শৃঙ্খলা, দয়া, দাক্ষিণ্যের ধর্ম। আর সন্ত্রাসবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শান্তি ও সন্ত্রাসবাদ প্রত্যয়দ্বয় দুই মেরুতে অবস্থানকারী দুটি বিষয়। সুতরাং ইসলামের সাথে এর দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, ইসলামী শাসনব্যবস্থা ক্বায়েমের নামে বিভিন্ন পন্থায় জনগণকে হত্যা করা নিছক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ আমাদের সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক্ব দিন— আমীন! ছুম্মা আমীন!!

## 'হারামাইনের মিম্বার থেকে'-এর বাকী অংশ

যে ইনছাফ বা ন্যায়পরায়ণাতার চরিত্র দ্বারা ভূষিত ও সজ্জিত হতে ইচ্ছা করে, সে যেন স্বার্থপরতার ব্যাপারে নিজের মধ্যে হিংসা ও বাড়াবাড়ির রোগ অনুসন্ধান করে। যদি সে হিংসা ও বাড়াবাড়ির প্রভাব লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন তার আত্মাকে প্রশিক্ষণ দেয় ও বাধ্য করে যতক্ষণ না সে তার স্বভাবসূলভ আচরণ বা ফিতরাতের দিকে ফিরে আসে।

**হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার উত্তম পন্থা হচ্ছে,** মানুষকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর হিকমাহ বা প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। ফলে পাপে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সে ইলাহী প্রজ্ঞার বিরোধিতাও করবে না, অপছন্দও করবে না।

**আত্মপ্রীতি ও স্বার্থপরতার মধ্যে বাড়াবাড়ি করার** ওষুধ বা প্রতিকার হলো, সংশোধিত হওয়া, যাতে আবেগ ন্যায়সঙ্গত হয়, যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং অন্যের অকল্যাণের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করবে। ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ইনছাফ অর্জন করতে চায় সে যেন তার স্বেচ্ছাচারী মনকে প্রতিপক্ষের জায়গায় স্থাপন করে। এতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল বা চকচক করতে থাকবে।

পরিশেষে সম্মানিত খত্বীব, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের, মুমিনদের মা তাঁর স্ত্রীগণের, তাঁর ছাহাবীগণের, তাদের অনুসারীগণের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করেন, যা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

**তারপর নিম্নের দু'আগুলো করে খুৎবা সমাপ্ত করেন :**

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি দান করো, দ্বীনের ভূখণ্ডকে রক্ষা করো, তোমার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করো, মুসলিমদের থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করো, বিপদগ্রস্তের দুঃখ-কষ্ট দূর করো, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করো, আমাদের এবং মুসলিমদেরকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করো। হে পরম দয়ালু! তোমার রহমত দিয়ে সবকিছু করো।

হে আল্লাহ! আমাদের দেশে নিরাপত্তা দান করো, আমাদের নেতা ও শাসকদের সংশোধন করো, আমাদের নেতা ও শাসকদের সত্য, সক্ষমতা ও সঠিকতা দ্বারা শক্তিশালী করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে আসে এমন কাজ করার তাওফীক্ব দান করো।

# হঠাৎ কেন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান নিয়ে এত অস্থিরতা?

-জুয়েল রানা*

**ভূমিকা :** সাম্প্রতিক সময়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন ব্যবসা পদ্ধতিতে ক্রেতাদের কাছ থেকে কয়েক মাস আগে অগ্রিম টাকা সংগ্রহ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য সরবরাহ করতে আরও বেশি সময় নেয়। এছাড়া, প্রায়ই তারা ক্রেতাদের জানিয়ে দেয় যে, তাদের অর্ডার করা পণ্যগুলো শেষ হয়ে গেছে বিধায় সেটা পাঠানো সম্ভব নয়। তবে মাসের পর মাস অপেক্ষার পরেও প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে ক্রেতারা তাদের টাকা ফেরত পান না বলে অসংখ্য অভিযোগ ওঠে।

**ই-কমার্স কী :** ই-কমার্স (ইলেকট্রনিক কমার্স নামেও পরিচিত) হলো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়, অর্থ স্থানান্তর এবং ইলেকট্রনিক (ইন্টারনেট) মাধ্যমে তথ্য স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া। এই নেটওয়ার্ক মানুষকে দূরত্ব এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যবসা ও সেবা করার সুযোগ দেয়।

**ই-কমার্সের যাত্রা ও বিকাশ :** ১৯৭৯ সালে ইংলিশ উদ্যোক্তা মাইকেল অলড্রিচ অনলাইনে ই-কমার্স ধারণা দিলেও ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৯১ সালে ইন্টারনেট সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হলে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আমাজন মূলত ই-কমার্স ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে। বর্তমানে এর ব্যাপকতা এতটাই যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বহু মানুষের জীবিকার উৎস ই-কমার্স। যা-ই হোক, দেশের অত্যধিক জনসংখ্যা, বিশেষ করে অল্প শিক্ষিত ও গরীবদের ভাগ্যোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়েছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কালের বিবর্তনে গণমাধ্যমে আসছে এদের ছলচাতুরীর কথা। কিন্তু যার দ্বারা ই-কমার্সের এত প্রসার অর্থাৎ আমাজনের ব্যাপারে কয়টা প্রতারণার খবর পত্রিকায় পাই? নিন্দনীয় কিছু তো নেই-ই, উপরন্তু প্রতিষ্ঠানটি লভ্যাংশের কিয়দংশ বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও মানবকল্যাণে বিনিয়োগ করে।

অস্ট্রেলিয়ায় বেশির ভাগ মানুষ মূলত অনলাইনে কেনাকাটা করে, কখনো শুনিনি অমুক প্রতিষ্ঠান আপনার ফোনের অর্ডারে সাবান পুরে দিয়েছে। আবার যেকোনো দেশে ব্যবসা করতে চাইলে সেখানকার নিয়মনীতি অবশ্যই পালনীয়। যেমন, উবার অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা শুরু করতে চাইলে দেশটির ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকার প্রথমে নিয়মনীতি বানায়। অর্থাৎ বিষয়টার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তাদের ব্যবসার অনুমতি দেয়। বলা বাহুল্য, ই-কমার্সসংক্রান্ত দু-একটা বাজে ঘটনা ঘটলে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিকতার কথা গণমাধ্যমে বারবার চাউর না হলে কেউ মাথা ঘামায় না। আর তদারককারী সংস্থাগুলোর ব্যবহার একপ্রকার ধরি মাছ না ছুঁই পানি। যেমন ই-ভ্যালি, কয়েক দিন আগে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিল অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ধর্মের নামে প্রতারণা করে এহসান গ্রুপ ১৭ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে বলে প্রকাশ। ই-অরেঞ্জের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ায় প্রতিষ্ঠানটির একজন ভারতে গ্রেফতার হলো। মজার ব্যাপার হলো প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গেটওয়ে দিয়ে। মানে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয় সম্পর্কে অবহিত। এত দিন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে টুঁ শব্দ শোনা না গেলেও এখন অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে লিখছেন। কেউ বিনিয়োগকারীদের লোভী বলছেন, কেউবা 'অতীত পর্যালোচনার' ভিত্তিতে বহুবিধ উপদেশ বাতলাচ্ছেন। সম্ভবত অবস্থা বেগতিক দেখে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং, বাণিজ্যমন্ত্রী ই-কমার্স নিয়ে নতুন আইন ও একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার ইঙ্গিত দেন। প্রশ্নটা এখানেই, এত আইন থাকার পরও নতুন আইন। তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলো কোন আইনে চলছে?

**বাংলাদেশে ই-কমার্সের যাত্রা ও আইন :** বাংলাদেশে ই-কমার্সের যাত্রা ব্যাপকভাবে শুরু হয় ২০১৩ সালে। সে বছরই অনলাইন বাণিজ্য করার অনুমতিপত্র দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কোনো আইন না থাকার পরও দায়িত্বশীল এক বা একাধিক কর্মকর্তা কেন এ ধরনের বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন? আর কেউ তা পরখ করেও দেখল না বা এমন প্রশ্ন তুলল না যে, আইনই তো নেই! আইন ছাড়াই এর যাত্রারম্ভ হয় কী করে? কোন ক্ষমতা বলে তিনি বা তারা অনুমতি দিলেন? আইন ছাড়াই যদি এমন একটি সম্ভাবনাময় বাণিজ্যের ছাড়পত্র বা লাইসেন্স দেওয়া যায়, তা হলে আইনের কী দরকার? যেকোনো ব্যাপার, আইন থাক বা না থাক, পারমিশন দিলেই যদি তা চলতে পারে, তাহলে একটি রাষ্ট্র আইন-আদালত ছাড়াই চলবে? আইন কেন লাগে, তা

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

তো এখন বোঝা যাচ্ছে। ই-ভ্যালি ও ই-অরেঞ্জের প্রতারণার পথ ধরে আরো কিছু অনলাইন বিজনেস কোম্পানি ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করেনি। প্রতারিত করে তাদের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। এরপরই মূলত সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা খোঁজ করছে আইন আছে কি নেই। এখন জানা যাচ্ছে, ই-কমার্সসংক্রান্ত কোনো আইনই দেশে নেই। কেউ কেউ বলছেন, একটি কমিশন আছে। তবে সেই কমিশনেরও নেই কোনো নীতিমালা, যা দিয়ে প্রতারকদের আটকানো যেত এবং প্রতারিত ক্রেতারা ফেরত পেতে পারত তাদের টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক মাস দুয়েক আগে ই-ভ্যালির কাণ্ড প্রকাশের পর একটি গাইডলাইন দিয়েছিল পণ্য দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করে। সেটুকুই মাত্র ক্রেতাদের জন্য করা হয়েছে।

ই-কমার্স চালুর পর থেকে লাইসেন্স নিয়েছে ১৬০৯টি প্রতিষ্ঠান। ই-ক্যাব নামে তাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তারা অদ্যাবধী ১৬ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। তারা (বেশ কিছু) গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করেছে, অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের কর্তারা এ সম্পর্কে মোটেও টের পেলেন না। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? সরকার বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কীভাবে প্রতারিত ক্রেতাদের অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা করবেন? তাদের তো কোনো আইনই নেই। শোনা যাচ্ছে, এখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইন করার আয়োজন করছে।

**ধামাকা অফারে আকৃষ্ট লোভী ক্রেতারা :** পণ্য কিনলেই অর্থ ফেরতের অস্বাভাবিক 'ক্যাশব্যাক' অফার দিয়ে ব্যবসা করেছে বাংলাদেশি ডিজিটাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালি। প্রথম দিকে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার দেওয়া হয়েছিল। পরে তা ৪০ শতাংশ করা হয়। অর্থাৎ ১০০ টাকার পণ্য কিনলে সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি অর্থ ফেরত দেওয়ার লোভনীয় এই অফারে হাজার হাজার গ্রাহক আকৃষ্ট হয়েছেন।

পণ্য কেনার জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিয়েছেন। কেউ কেউ লাভবানও হয়েছেন। আর বাকিরা ছিলেন লাভবান হওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ই-ভ্যালির 'জাদুর বেলুন' চুপসে গেছে। মামলা হওয়ায় এর কর্মকর্তারা এখন জেলে আছেন। আর গ্রাহকরা পাওনা টাকার জন্য বিক্ষোভ করতে গিয়ে পুলিশের পিটুনি খেয়েছেন। লোভে পড়ে গ্রাহকরা ধানগাছে শরিষা আশা করেছিলেন। এখন আর বিক্ষোভে কী ফল হবে?

যে জিনিসটা সবার বোঝা উচিত তা হচ্ছে, বিক্রেতা বা কোম্পানি আপনাকে পণ্যের সঙ্গে ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ টাকা ফেরত দিচ্ছে, সে কীভাবে তা দিচ্ছে? নিশ্চয়ই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে বা পকেট থেকে দেবেন না। সেটা দিলে দেবেন অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অন্য কোনো অনৈতিক উপায়ে। খুবই স্বাভাবিক নিয়মে ই-ভ্যালির প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রাহক প্রতারিত হয়েছেন।

ই-ভ্যালির মতো জোচ্চুরির প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য কেনার জন্য লাখ লাখ মানুষের লাইন দেওয়া-এর পেছনে রয়েছে লোভ। আমাদের দেশের মানুষ এখন লোভের পেছনে, লাভের পেছনে ছুটে চলেছে। এই যে দেশে এত চাঁদাবাজি, এত দুর্নীতি, এত মাদক ব্যবসা— এসবের কারণও কিন্তু স্রেফ চটজলদি বড়লোক হওয়ার দৌড়। এই দৌড়ে কেউ পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। তাই তো ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাহীন সবাই চায় ফাস্ট হতে, যে কোনো মূল্যে দ্রুত বড়লোক হতে। এজন্য সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।

বর্তমান সময়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে উঠা মানসিক দৃঢ়তা ও পারিবারিক শিক্ষাই পারে আপনাকে অসৎ ব্যবসায়ীদের চটকদার বিজ্ঞাপন থেকে দূরে রাখতে। আপনার অধিক লোভ আর অসৎ ব্যবসায়ী— দুইয়ের সমন্বয়ে কিন্তু আপনি সর্বস্বান্ত। যাক, জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পদের মোহ হতে মুক্ত হতে চাইলে জার্মান সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ এরিক ফ্রমের উক্তি— 'লোভ তলাবিহীন খন্দ, তৃপ্ত হওয়ার নিরন্তর চেষ্টা ব্যক্তিকে শুধুই নিঃশেষ করে, কিন্তু কখনোই পরিতৃপ্তি দেয় না'— আপনি নিজেসহ পরিবারের সবার জন্য এটা রপ্ত করতে পারেন।

**বাংলাদেশ ব্যাংকের অবাক করা তথ্য :** বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ই-কমার্স মার্কেট গত আড়াই বছরে প্রায় ১০ গুণ বড় হয়েছে। ২০২০ সালে প্রতি মাসে ২০১৯ সালের যে কোনো মাসের তুলনায় অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্মগুলোর লেনদেন ও টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ, তিন গুণ এমনকি চার গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। কিন্তু, গত ৩-৪ মাসে একের পর এক ই-কমার্স কোম্পানিগুলোর অনিয়মের তথ্য বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। ফলে অনলাইন কেনাকাটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠা গ্রাহকরা হঠাৎ করেই বড় একটি ধাক্কা খান। কয়েক লাখ গ্রাহক অনলাইন প্লাটফার্মে আটকে থাকা তাদের কয়েকশ কোটি টাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

**('সাময়িক প্রসঙ্গ'-এর বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়)**

# আসল বিজয়ী কে?

*-কাযী ফেরদৌস করীম (মুন্নি)**

মহান আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূল ﷺ-কে মানতাম! তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিশাপ’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৬৬-৬৮)*।

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সত্য কখনও সংখ্যাধিক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার কারণেই সত্যের পতাকাবাহীরা কখনই কথিত সংখ্যাধিক্যদের পরোয়া করেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যের অনুসারীরা সকল সময়ই সংখ্যায় কম ছিল। আর কম থাকাটাই সত্যের পরিচয়, যা স্পষ্টভাবে আল-কুরআনের পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে। তাই সংখ্যাধিক্যের উপর ভিত্তি করে নিজেকে সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী ভেবে আত্মতৃপ্তিতে ভোগা উচিত নয়; বরং চিন্তা-গবেষণা করে দেখতে হবে আমার পছন্দের নেতা এবং নেতার মতামতগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদর্শের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

যদি সত্য পথের সন্ধান করতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদর, উহুদ, খন্দক, আহযাব, হুদায়বিয়া, মক্কা বিজয় ও হুনাইনসহ অন্যান্য জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈন্যসংখ্যা এবং এর বিপরীতে কাফেরদের সমরস্ত্র সজ্জিত বিশাল সৈন্যবহরকে ভালো করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একনিষ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে দেখতে হবে। তখন এর উত্তর পেতে আর কারও অসুবিধা হবে না। খুব নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, প্রত্যেক চিন্তাশীলের অন্তরদৃষ্টি খুলে যাবে ইনশা-আল্লাহ। এরপর আসুন! খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক, তারা কি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, না-কি সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন? তারা ছিলেন হাতে গোনা স্বল্পসংখ্যক ছাহাবা। তবে তাঁরা ঈমানের বলে বলীয়ান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর একান্ত অনুগত ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি। কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত তারা মুমিন নয়’ *(আন-নূর, ২৪/৪৭)*।

আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে এইভাবে বলেছেন, ‘মুমিনের বক্তব্য কেবল একথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম’ *(আন-নূর, ২৪/৫১)*।

আল্লাহ প্রদত্ত এরকম স্পষ্ট দলীল থাকার পর কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ সংখ্যাধিক্যতার দোহাই দিয়ে শিরক, বিদআত, কুফর ইত্যাদি কর্মে জড়িত থাকাকে অহংকারের বিষয় মনে করে এবং ছহীহ আক্বীদায় বিশ্বাসীদেরকে ওয়াহাবী, লা মাযহাবী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করতে বিন্দুমাত্র দিধাবোধ করে না; এমনকি আহলে খবীছ বলে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সত্য পথের অনুসারীরা সর্বদা বিপথগামী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়েছে; বর্তমানেও হচ্ছে, হবে— এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে। তাদের ধৈর্যের কারণে আজ আমি এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১০৯-১১১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

এখন আল্লাহ ছহীহ আক্বীদার বিপরীতে চলা লোকদেরকে বুঝ দিলেই বুঝতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ, নয়তো নয়। আল্লাহ হেদায়াতের মালিক। আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন ও কবুল করুন— আমীন!

* বি’র আলী, হাই উম্মে খালেদ, মদীনা, সঊদী আরব।



www.al-itisam.com

# ক্বীমাতুয যামান বা সময়ের মূল্য

-সায়্যিদ তাসনীম আল-আমান*

قِيْمَةُ الزَّمَن (ক্বীমাতুয যামান) দুটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে সময়ের মূল্য। এটি দুটি শব্দের একটি ছোট্ট শিরোনাম হলেও এর মাঝে লুকিয়ে আছে বিশাল অর্থের সমাহার। কেননা পৃথিবীর আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক সফল মানুষই সময়ের মূল্য বুঝেছেন এবং তা যথাসাধ্য ব্যবহার করেছেন। যারাই সময়ের মূল্য বুঝেছেন তারাই সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন। একজন কৃষক যেমনভাবে সময়কে কাজে লাগায় একজন রাজমিস্ত্রি কিন্তু সময়কে সেভাবে কাজে লাগায় না। অর্থাৎ একজন কৃষকের কাছে সময়ের মূল্য যেমন রাজমিস্ত্রির কাছে সময়ের মূল্য ঠিক তেমন নয়। আর ঠিক এভাবেই প্রত্যেক সত্তার কাছে সময়ের মূল্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি ভিন্ন। আর ঠিক একইভাবে একজন প্রকৃত আলেমে দ্বীন ও ত্বলেবে ইলমের কাছে সময়ের মূল্য আরও মূল্যবান এবং ভিন্ন।

কিন্তু আমরা কে কীভাবে সময়ের ব্যবহার করছি? কতটুকু সময়ের মূল্য দিচ্ছি? আমরা কি সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করছি? নিজেকে প্রশ্ন করলেই আমরা এর সঠিক উত্তর পেয়ে যাব। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ 'যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর, তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালেম, অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*। যেখানে আমরা আমাদের অস্তিত্বের সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহর অথৈ নেয়ামতে নিমজ্জিত। কিন্তু সেখানে আমরা নানা অপ্রয়োজনীয় কাজে আমাদের সময়কে অতিবাহিত করছি আর বলছি যে, আল্লাহর শুকরিয়া তো করছিই, সময়কে তো কাজে লাগাচ্ছিই।

এই জগৎ সংসারের সূচনালগ্ন থেকেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আকাশ-বাতাস, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র এমনকি বিশ্বের সকল কিছুকেই এক নির্ধারিত সময়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। সূর্যের উদয়াস্তের এই চক্র সময়ের ফ্রেমেই শিকলবন্দী। আর ঠিক তেমনভাবেই চন্দ্রের খেলা আমরা প্রতি নিশিতেই লক্ষ্য করি। আর এভাবেই মহান আল্লাহ এই দিবারাত্রিকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই পরিচালনা করে আসছেন। আর তিনি এখানেই ক্ষান্ত নন, আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানকেও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন হজ্জ একটি নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। আর ছালাতেরও রয়েছে নির্ধারিত সময়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো, নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপরে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয' *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*। আর ঠিক এই একই কথা বর্ণিত হয়েছে হাদীছে। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا 'শুরুর সময়ে ছালাত আদায় করা'।[১]

আমরা উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারি। যেখানে মহান আল্লাহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকনটিকে সময় নির্ভর করে দিয়েছেন। সময়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় সময়ের কসম করেছেন। তিনি বলেন,﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى-وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ 'শপথ রাত্রির! যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের! যখন তা উদ্ভাসিত হয়' *(আল-লায়ল, ৯২/১-২)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَالضُّحَى-وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ 'শপথ পূর্বাহ্নের! শপথ রাত্রির! যখন তা গভীর হয়' *(আয-যুহা, ৯৩/১-২)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَالْفَجْرِ-وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ 'শপথ ফজরের! শপথ দশ রাতের!' *(আল-ফজর, ৮৯/১-২)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَالْعَصْرِ-إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ 'সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আল-আছর, ১০৩/১-২)*। এভাবে আল্লাহ তাআলা কোথাও দিনের, কোথাও রাতের, কোথাও সকালের আবার কোথাও সময়ের কসম করেছেন। এভাবে রাত-দিনের কসম করে আল্লাহ তাআলা রাত, দিন, সকাল ও সন্ধ্যা এবং সর্বোপরি সময় নিয়ে বান্দাদেরকে চিন্তা ও গবেষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো খুব কম লোকই এগুলো নিয়ে গবেষণা করে, খুব কম সংখ্যক মানুষই সময়ের গুরুত্ব বুঝে।

সময়ের গুরুত্ব যে অপরিসীম এ কথার কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদেরকে সময়ের মূল্য দিতে হবে, সময়কে ভালো কাজে লাগাতে হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে, হেলায় খেলায় অহেতুক কাজে সময়কে নষ্ট করা যাবে না। সময়

* ছানাবিয়্যাহ ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

১. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৪৭৯।



www.al-itisam.com

এমন এক অমূল্য রত্ন, যা একবার চলে গেলে আর কখনই ফিরে আসে না। তাই উদাহরণ দেওয়া হয়, সময় হলো বহমান নদীর স্রোতের ন্যায়। নদীর স্রোত যেভাবে বয়ে চলে নিরবধি, যা একবার বয়ে চললে আর কখনো ফিরে আসে না। ঠিক সময়ও এরকম, যা একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। ধনসম্পদ তো হারিয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সময় যদি হারিয়ে যায় তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। আর এ নিয়ে তো একটা বিখ্যাত ইংরেজি বাক্য আছে যা সবারই জানা, Time and Tide wait for none/no man. অর্থাৎ সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

যদি আমরা আমাদের সালাফে ছালেহীনের দিকে দেখি, কীভাবে তারা সময়কে কাজে লাগিয়েছেন তাহলে দেখব যে, আমাদের আর তাদের মাঝে কত পার্থক্য! কত মনীষী তো না খেয়ে শুধু পড়ার পিছনে সময় দিয়েছেন। কতজন তো না ঘুমিয়ে পড়ার পিছয়ে সময় দিয়েছেন। তারা এতই পরিশ্রম করেছেন যে, আমাদের পরিশ্রম তাদের পরিশ্রমের ধারে কাছেও না।

আমরা দেখি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহিমাহুল্লাহ-কে, যিনি একাধারে ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম আবু হাতিম রাযী রহিমাহুল্লাহ-এর মতো বড় বড় মুহাদ্দিছীনে কেরামের শিক্ষক ছিলেন। আলী ইবনুল মাদিনী রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, ইলম যেন তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি তার পিতার ওয়ারিছ সূত্রে ১০ লক্ষ মুদ্রা পান। কিন্তু তিনি তার সম্পদের সবটুকুই তার পড়াশোনার পিছনে ব্যয় করেন। এমন এক সময় আসে যখন তার কাছে স্যান্ডেল কেনার মতো মুদ্রা ছিল না। তিনি তার পড়াশুনার পেছনে এতটা সময় ব্যয় করেছেন যে, এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে আরাম-আয়েশ করার মতো সময় তার হয়নি।

হাফেয ইবনু মানদাহ রহিমাহুল্লাহ তিনি ৪৫ বছর শিক্ষাঙ্গনে কাটান। জানা যায় তার শিক্ষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭০০ জন। সুবহানাল্লাহ! তাদের কাছে সময় অতিবাহিত করার মানেই ছিল জ্ঞানার্জন। আর আমাদের কাছে সময় অতিবাহিত করার মানেই হচ্ছে ক্যারিয়ার গঠন। আর বর্তমান দুনিয়াতে তো ক্যারিয়ার গঠনের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে টাকা-পয়সা উপার্জন। আসলেই এটা আমাদের জন্য একটি দুঃখজনক বিষয় ।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর একটানা দুই বছর বিছানায় পিঠ রেখে ঘুমানোর মতো সময় হয়নি। সারাদিনে ১২টি বইয়ের দারস নিতেন এবং দিনে মাত্র এক বার খেতেন, ক্বাযায়ে হাজাতের (প্রাকৃতিক প্রয়োজন বেড়ে যাওয়া) ভয়ে। আর এভাবেই তিনি লাগাতার ছয় বছর পরিশ্রম করেছেন। আর আমাদের কাছে তো দিনের একটা নির্দিষ্ট অংশে বই নিয়ে বসে থাকাটাই পরিশ্রম।

এভাবে যদি আমাদের পূর্ববর্তী সকল আলেমে দ্বীন, আমাদের সালাফে ছালেহীন, সফল ব্যক্তিগণের দিকে লক্ষ্য করা হয় তাহলেই তাদের কাছে সময়ের মূল্য কতটুকু ছিল এবং তারা সময়কে কীভাবে মূল্যায়ন করতেন তা উপলব্ধি করা যায়। ‘কানযুল আজদাদ’ গ্রন্থে মুহাম্মাদ কুরদ আলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু জারীর আত্ব-ত্বাবারী রহিমাহুল্লাহ তার জীবনে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করতেন না। কারণ তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় ৮৬ বছর। আর তার লিখিত রচনাবলির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার। সে হিসেবে তিনি দিনে গড়ে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা করে লিখতেন। সুবহানাল্লাহ।

ইয়াহইয়া ইবনে হাবায়রা রহিমাহুল্লাহ বলেন, الوقت أنفُسُ ما عُنيتَ بحفظه وأراه أَسهلَ ما عليك يضيع ‘যা কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পার, তন্মধ্যে সময় হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান। অথচ আমি দেখছি, সেটাই সবচেয়ে সহজে তোমার কাছে বরবাদ হচ্ছে’।

আর সময়ের মূল্য বোঝানোর জন্য বলা হয়, الوقب كالسيف إن لم تقطعه قطعك অর্থাৎ ‘সময় হলো তরবারির মতো, যদি তুমি তাকে না কাটো, তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে’। অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে তুমি সময়কে কর্তন করো। যথাযথভাবে সময়কে কাজে লাগাও। সে যেন তোমাকে কাজের আশ্বাস দিয়ে নিষ্কর্মা ও নিঃশেষ করে দিতে না পারে। এ বাক্যের অর্থ আরও স্পষ্ট করার জন্য বলা যায়, তুমি যদি সময়কে কাজে লাগানো এবং সময় থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে

সজাগ না হও, তাহলে তুমি তরবারির আঘাতের সম্মুখীন হবে। কেননা, তরবারি থেকে আত্মরক্ষা জন্য যদি সজাগ না হও, তবে তরবারির আঘাত তোমাকে শেষ করে দিবে।

আমাদেরকে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সময় দিতে হবে। এখন যদি কেউ বলে খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তাই আমি সারাদিন খেলব অথবা খাওয়া তো আবশ্যকীয় বিষয় সুতরাং আমি দিনে ছয় বেলা করে খাব, তাহলে সেটি হলো বোকামী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ধরুন একটা কলস রয়েছে এবং তার পাশে কিছু পাথরের ছোট্ট ছোট্ট টুকরা, বালি, ইটের গুড়া এবং পানি রয়েছে। এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে, কলসটা এমনভাবে পূর্ণ করুন যাতে করে সবগুলো পদার্থই তার মধ্যে থাকে। এখন যদি আপনি আগে পানি দিয়ে কলসটা পূর্ণ করে দেন তারপর যদি অন্য জিনিস সেটাতে রাখতে চান তাহলে তো পানি উপচে পড়ে যাবে। আবার যদি আগে বালি দিয়ে পূর্ণ করে ফেলেন তাহলে পাথরের টুকরাগুলো রাখার জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না।

কিন্তু যদি আপনি প্রথমে পাথরের টুকরোগুলো রাখেন তাহলে দেখবেন পাথরগুলোর আকার বড় হওয়ার কারণে বেশকিছু অংশ ফাকা থাকবে, তারপর আপনি ইটের গুড়া রাখেন, তারপর বালিকণা রাখেন, তারপর পানি রাখেন তখন দেখবেন বালু প্রয়োজন অনুযায়ী পানি চুষে নিবে এবং প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ অবস্থানে চলে যাবে।

আর এভাবেই কলসটা একদম আপনার চাহিদা অনুযায়ী পূরণ হয়ে যাবে।

ঠিক সেই পাথরের টুকরাগুলোর মতোই হচ্ছে আমাদের জীবনে ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং আমাদের ইবাদত। আর অন্যান্য বিষয়গুলি সেই ইটের গুড়া, বালুকণা এবং পানির মতো। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে জীবনে কোনটার প্রয়োজন কেমন এবং তদনুযায়ী তার পিছনে কতটুকু সময় দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়োজন বুঝে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

## 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-এর বাকী অংশ

**গোয়েন্দা নযরদারিতে ই-কমার্স সেক্টর :** সাধারণ গ্রাহকের কোটি কোটি টাকা লোপাট ও বিদেশে টাকা পাচারের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এক ডজন ই-কমাস প্রতিষ্ঠানকে নযরদারির মধ্যে রেখেছে একাধিক সংস্থা। একই সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দারা। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সংকটকে পুঁজি করে ওইসব প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। লোভনীয়, চটকদার ও ধামাকা অফারের খপ্পরে পড়ে পুঁজি হারিয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে লাখ লাখ গ্রাহকের। আসল পণ্যের ছবি দেখিয়ে নকল পণ্য দেওয়া, বিকাশ ও নগদে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করা, পণ্য না পাঠানো ইত্যাদি প্রতারণার যেন শেষ নেই তাদের।

**উপসংহার :** বিভিন্ন অফারের নামে বাজার মূল্যের চেয়ে যেসব ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অনেক কম দামে পণ্য বিক্রি করছে, পণ্য দেওয়ার আগেই টাকা নিচ্ছে অথচ সময় মতো পণ্য সরবরাহ করছে না সেসব ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে লোভনীয় অফার দিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে আগাম অর্থ গ্রহণ করে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেনের ক্ষেত্রে লাগাম টানার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে উচ্চ আদালত একটি সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে। তা হচ্ছে ই-ভ্যালি ও ই-অরেঞ্জের মালিকদের শর্তসাপেক্ষে নযরদারির ভেতরে রেখে ব্যবসায় ফিরিয়ে আনা এবং প্রতারিতদের টাকা ফেরত অথবা পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা।

প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃীত হাজার হাজার কোটি টাকার তুলনায় কোম্পানিগুলোর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ যৎসামান্য। এই পথে প্রতারিতদের টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ব্যবসার গতি না থামিয়ে, তাকে আইনের আওতায় আনাই কর্তব্য। সরকার সেই পথেই হাঁটছেন। এটি একটি শুভ লক্ষণ। আমরা সব ক্ষেত্রে ভালো কিছু দেখতে চাই। অশুভ চিন্তা দূর হোক সমাজ-সংসার, রাজনীতি, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক অ্যাভিনিউ থেকে— এটাই হোক আমাদের মৌলিক চিন্তা।

# একদল যুবকের দ্বীনে ফেরার গল্প

-মো. হামিদুর রহমান (তামিম)*

একজন যুবকের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একদল যুবক। একজন যুবকের দ্বীনে ফেরার গল্পই একদল যুবকের দ্বীনে ফেরার গল্প। একজন যুবক যখন জন্মগত মুসলিম হয়ে মুসলিম সমাজে বাস করে, তখন সে বুঝতে পারে না, ফিতনা কী? কিন্তু ঐ যুবকই যখন আল্লাহর রহমতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তখন সে যুবক বুঝতে পারে ফিতনা কী! সে যখন জন্মগতভাবে মুসলিম ছিল কিন্তু ইসলাম থেকে দূরে ছিল, তখন সে অন্ধকারকেই আলো ভাবত। আর সে অন্ধকারের উপাদান ছিল— গান-বাজনা, প্রেমের নামে যেনা, মদ-সিগারেট, জুয়া, গেমস, অশ্লীলতা ইত্যাদি। সেই যুবক এগুলোকেই জীবনের আলো ভাবত। একসময় সেই যখন আল্লাহর হেদায়াত পায়, তখন সে বুঝতে পারে, সে ফিতনায় পড়ে আছে। তারপর আল্লাহর রহমতে সে এসব হারাম কাজ ছাড়তে থাকে। সে ছালাত আদায় করতে শুরু করে, দাড়ি রাখে, টাখনুর উপর প্যান্ট পরে, নিজের চোখকে হেফাযতে রাখার চেষ্টা করে। এককথায় সে সব হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যুবকের মনে হতে থাকে তার জীবনে সমস্যা তৈরি হতে শুরু করেছে। আর এটার বড় কারণ হলো— সে একসময় যেগুলোকে নিজের জীবনের আলো ভাবত, সেগুলোকে সে এখন ফিতনা বা হারাম বলে চিনে। সে দেখতে পায় তার আশেপাশের মানুষ হারামগুলোকে ফিতনা ভাবছে না। এমনকি তার পরিবারও হয়তো অন্ধকার জীবনকে ফিতনা মনে করে না। কিন্তু ঐ যুবক নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে চায়। সেই সময় দাড়ি রাখার কারণে হয়তো শুনতে হয় জঙ্গি। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অনেকেই বলে, হয়তো হুজুর হয়ে গেছে। অনেকেই বলে, হয়তো নতুন ভাব ধরেছে। হয়তো তার পরিবারও বিরুদ্ধে যেতে পারে। এভাবে ইসলামের প্রতিটা ধাপ পার করার সময় তাকে অনেক নতুন সমস্যায় পড়তে হয়। এই বার যুবক ভাবতে থাকে, আমার রাষ্ট্র যদি পুরোপুরি ইসলামের রাষ্ট্র হতো তাহলে আমার পথ চলা অনেক সহজ হতো। আমার আশেপাশের মানুষগুলো যদি আমার মতো হতো তাহলেই ভালো হতো। এবার দ্বীনে ফেরার পরে একদল যুবকের দুইটা পথ তৈরি হয়। একদল যুবকের কিছু যুবক ঠিক করে, দ্বীনে চলার পথে যতই বাধা আসুক, যতই ফিতনা আসুক— আমার জীবন থাকা পর্যন্ত দ্বীনের উপর টিকে থাকব ইনশা-আল্লাহ। কিন্তু বাকী যুবকরা চারিদিকের ফিতনা দেখে ভাবতে শুরু করে— কখন কিয়ামত হবে, কখন তার মৃত্যু হবে। এখন সে মৃত্যুকে ভয় পায় না, কারণ তার ঈমান তাকে ভয় পেতে দেয় না। তাই চারিদিকের ফিতনা দেখে সে ভাবতে শুরু করে, কিয়ামত যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে আমি ঈমান নিয়ে মরতে পারব। কিন্তু কিয়ামতের খবর একমাত্র আল্লাহর কাছেই *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮৭)*। তাই যুবকেরও জানার পথ নাই কিয়ামত কবে হবে! তখন সে ভাবতে থাকে ফিতনা থেকে বাঁচার নতুন পথ। তখনই সে একদল আলেম ও মিডিয়ার সন্ধান পায়, যারা জিহাদের কথা বলে। আর সেই যুবকও ভাবতে থাকে, ঠিক! জিহাদ দিয়ে সব ফিতনা দূর করে দেওয়া যাবে। এমনকি জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও অনেক বড় লাভ। তাই সে জিহাদের বাসনা নিজের মধ্যে লালন করে আর ভাবতে থাকে, জিহাদ হচ্ছে না কেন? সেই সময় সে দেখতে পায়, চারিদিকে মুসলিম মার খাচ্ছে অথচ কেউ জিহাদের ডাক দেয় না। এমনকি সে যেসব আলেমকে দেখতে পায়, যারা স্টেজে উঠে, মিডিয়ায় জিহাদের বয়ান করে ঈমানের তীব্রতা প্রকাশ করছে কিন্তু তারাও কোনো জিহাদ করছে না বা জিহাদের ডাক দিচ্ছে না। অন্যদিকে সে দেখতে পায়, একদল আলেম ইসলামের সব ধরনের আলোচনা করলেও জিহাদের ডাক দেয় না। এমনকি তারা সেই যুবকদের সাবধান করছে, তারা যেন জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করে। এই সময় সে যুবক তার জীবনে কয়েকটা নতুন শব্দ খুঁজে পাই। যেমন— দরবারী আলেম, ত্বাগূতের দালাল, পেট্রোডলার, শাসকের টাকা খায় ইত্যাদি। আর এসব শব্দ তাদের শিখিয়েছে সেই সব আলেম, যারা জিহাদের বক্তব্য করে, কিন্তু নিজেরাও কোনোদিন জিহাদ করেনি। আর দ্বীনে ফেরা সেই যুবকগুলো এসব আলেমের বক্তব্য ঠিক মনে করে, এক শ্রেণির আলেমকে দরবারী আলেম, ত্বাগূতের দালাল ইত্যাদি বলতে থাকে কিন্তু সেই যুবক দ্বীনে ফেরার পর থেকে আজ পর্যন্ত জিহাদের কোনো ডাক পেলো না। তখনই সে আবার ফিতনায় পড়ে যায়। কারণ সে ভেবেছিল, জিহাদ দিয়েই হয়তো এসব ফিতনা দূর করা যাবে। কিন্তু জিহাদের কোনো

* শিক্ষার্থী, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।



www.al-itisam.com

ডাক তার জীবনে না আসায় শয়তান তার জীবনে অতীতের মতো ফিতনার বীজগুলো রোপণ করতে থাকে। 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৫৩)*। সেই যুবক দ্বীনকে নিজের জীবনে সাময়িক ভেবে নিয়েছিল। সেই যুবক দ্বীনে ফেরার পরে তার যে ঈমানের তীব্রতা ছিল, হারাম-হালালের বিবেচনার যে ক্ষমতা ছিল, তা শয়তান আবার কেঁড়ে নিচ্ছে। দ্বীনে ফেরার পরে সে অনলাইন-অফলাইন দুই জীবনেই যেনার ফিতনা, গান-বাজনার ফিতনা, সব ধরনের হারাম থেকে বেঁচে থাকত। দ্বীনে ফেরার পূর্বে সে তার অনলাইন টাইমলাইনে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে, বিভিন্ন ধরনের নারীর ছবি, গান-বাজনা শেয়ার করত। কিন্তু দ্বীনে ফেরার পর সে সমস্ত কিছু মুছে দেয়। আর সেই যুবক ফিতনাগুলো দ্রুত নিজের জীবন থেকে দূর করতে চেয়েছিল জিহাদ দিয়ে। জিহাদের ডাক না আসায়, দেখা যায়— সে আবার ভুলতে শুরু করেছে হারাম-হালালের বিবেচনা। সে এখন অনলাইন টাইমলাইনে নারীর ছবি, গান-বাজনা শেয়ার করে দিলেও আগের মতো ভাবে না। সে এক শ্রেণির আলেমকে দরবারী আলেম বলাকে জিহাদ বানিয়ে নিয়েছে। তবে এই দল যুবকের সবাই এখনো হারাম-হালালের বিবেচনা ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু তার মাথায় রয়েছে জিহাদের ডাক আসে না কেন? সে তার ঈমানকে জিহাদের সময়কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। কিন্তু তাকে ভাবতে হতো যদি ৫০ বছর পরও জিহাদ হয়, আর আমি যদি তার একদিন আগেও মারা যায় তবুও ঈমান নিয়েই টিকে থাকব ইনশা-আল্লাহ। যদি কিয়ামত চলে আসে, সব কিছু ধ্বংস হতে শুরু করে তবুও ঈমান নিয়ে টিকে থাকব, হালাল-হারাম বিবেচনা করেই চলব ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, 'কিয়ামত ক্বায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারও হাতে যদি কোনো গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে'।[১] তাই জিহাদ হোক আর না হোক আমাকে আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। সুতরাং আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঈমান নিয়েই টিকে থাকব ইনশা-আল্লাহ। এর মানে এই না যে, আমি জিহাদের বাসনা অন্তরে রাখব না; অবশ্যই আমার অন্তরে থাকবে জিহাদের বাসনা। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও রাখেনি, তবে সে মুনাফিক্বী অবস্থায় মারা গেল'।[২] এই একদল যুবক বা একজন যুবকের সাময়িক ঈমান নয়; পুরো জীবনের ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্যই আমাদের একটা হাদীছ মনে রাখতে হবে। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে, সে-ই আসল মুজাহিদ।[৩] আমি আপনি যদি এই হাদীছের বাস্তব উদাহরণ দেখতে চাই, তাহলে আপনার-আমার আশেপাশের একজন ভাই, যে নিয়মিত ছালাত আদায় করে না, দাড়ি রাখে না, টাখনুর উপর প্যান্ট পরে না, হারাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না— তাকে বলুন, এখন যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হয়, আপনি কি জিহাদে যেতে চান? তার উত্তর হবে—অবশ্যই যাব! যদি এমন উত্তর না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে সে ব্যতিক্রম। কিন্তু সে জিহাদের যাওয়ার কথা বললে, আপনি তাকে বলেন— ভাই, আপনি ছালাত কেন আদায় করেন না, দাড়ি কেন রাখেন না, টাখনুর উপর প্যান্ট পরেন না কেন? তারপর আপনি বুঝতে পারবেন— কেন সেই আসল মুজাহিদ, যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে! ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (হাফিযাহুল্লাহ) স্যারের একটি লিখিত অংশ নিম্নে পেশ করা হলো, যা একদল যুবকের অধিকাংশের সাথে মিলে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

"বেকারত্ব, বঞ্চনা ও হতাশার পাশাপাশি জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। আমাদের সমাজে যারা সর্বহারার রাজত্বের জন্য বা ইসলামী রাজত্বের জন্য সহিংসতায় লিপ্ত তাদের প্রায় সকলের জীবনেই আপনি এ বিষয়টি দেখতে পাবেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবককে কেউ বুঝিয়েছে, এরূপ সহিংসতার মাধ্যমে অতি তাড়াতাড়িই তোমার ও অন্যদের কষ্ট ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে এবং সর্বহারার রাজত্ব বা ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি ক্ষমতা ও কর্ম অথবা জান্নাত লাভ করবে। বঞ্চিত, বেকার ও হতাশ এ যুবক সহজেই এ কথা বিশ্বাস করে এ সকল কর্মে লিপ্ত হয়। কারণ তার অন্য কোনো কর্ম নেই এবং তার পাওয়ার আশার বিপরীতে হারানোর তেমন কিছুই নেই।"[৪]

১. আহমাদ, হা/১২৯৮১।

২. আবূ দাঊদ, হা/২৫০২।

৩. তিরমিযী, হা/১৬২১।

৪. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ।

## মা

-আব্দুর রহমান বিন জামিল
অধ্যক্ষ, জামি'আহ দারুল ইহসান আল-আরাবিয়্যাহ,
কালনী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সকাল বেলা হঠাৎ করে হাঁচি দিলাম যখন
পাশে থেকে বউটা ভয়ে লাফিয়ে উঠল তখন।
দুপুর বেলা হঠাৎ করে গায়ে এলো জ্বর
বন্ধুরা সব চিৎকার করে বলল এখান থেকে সর।
মাথা ব্যাথা নিয়েই যখন চলে আসলাম বাড়ি
বউটা দেখি বাচ্চা নিয়ে চলছে বাবার বাড়ি।
বললাম তারে কোথায় যাও গো কথা বলো না
করোনাতে ধরেছে তোমায় তাও কি বোঝ না।
সন্ধা বেলা গলা ব্যাথায় ভয় পেয়ে যাই আমি
মনে হলো সত্যিই আমি করোনার আসামি।
ডাক্তার যখন রক্ত নিল পুলিশ আসল তখন
লাল ফিতা সব বেঁধে দিল বাড়ি লকডাউন।
দূরে গেল আশেপাশে আপন যারা ছিল
করোনা ভাইরাস এখন আমায় মানুষ চেনালো।
বাড়িতে শুধু মা রয়েছে সবাই গেছে চলে
মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মোবাইলে কথা বলে।
মহা বিপদে পাশে শুধু পড়ে রইল মা
তাইতো বলি মাগো তোমার নেইকো তুলনা।
আস্তে আস্তে জ্বর তো গেলই গেল সর্দি-কাশি,
এখন আমি ভালোই আছি নেইতো কোনো হাঁচি।
হাসতে হাসতে বউটা এসে কামড় দিয়ে জিভ
বলল আমায় দেখো তোমার রিপোর্ট নেগেটিভ।
শুধু শুধুই কষ্ট দিলাম ক্ষমা করো মোরে
শত বিপদেও যাব না আর আমি কভু তোমায় ছেড়ে।
করোনা তুমি শিখিয়ে দিলে কে আপন কে পর
মায়ের চাইতে নেই তো আপন বাকি সবাই পর।

## ঈমান আর মুমিন

-আব্দুর রহমান
সুবার বাজার, পরশুরাম, ফেনী।

ঈমান হলো রবের প্রতি
অগাধ বিশ্বাস রাখা,
মুমিন হলো পুণ্য দিয়ে
পাপের বোঝা ঢাকা।
ঈমান হলো নবী-রাসূল
সত্যের বাহক তারা,
মুমিন হলো তাদের পথে
দিবে সবাই সাড়া।
ঈমান হলো আল-কুরআনে
মুক্তির দিশা আছে,
মুমিন হলো কুরাআন ছাড়া
অন্য কিতাব পাছে।
ঈমান হলো হাশরের মাঠে
কিয়ামতে হবে,
মুমিন হলো নেকীর কাজে
সর্বদা সে রবে।
ঈমান হলো জীবন দিয়ে
থাকা দ্বীনের পথে,
মুমিন হলো সফল হবে
চড়বে স্বর্গ রথে।

## আল-ইতিছাম

-মুস্তাক্বীম বিল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

পথভ্রষ্ট ছিলাম মোরা
অন্ধকারে ডুবে,
শান্তির বাণী নিয়ে এলো
আল-ইতিছাম তবে।
চিনি না কেউ সঠিক পথ
বুঝি না কেউ ভালো,
আল-ইতিছাম এসে সবার
জ্বালিয়ে দিল আলো।
হালাল-হারাম চিনিয়ে দিল
ভ্রান্তি গেল কেটে,
পাপ-পুণ্য আলাদা হয়ে
শান্তি এলো হেঁটে।
দ্বীন শিক্ষার সঠিক ধারা
ছড়িয়ে সবার মাঝে,
বিদআতীদের মাথায় বাড়ি
পাচ্ছে না পথ খুঁজে।
এসো সবাই সঠিক জানি
আল-ইতিছাম পড়ে,
মুক্তির পথ আলোয় গড়ি
আসল আমল করে।

# বাংলাদেশ সংবাদ

## ৫২ ভাগ শিক্ষার্থী বিষণ্নতায় ভুগছেন

করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে গত এক বছরে বেড়েছে মোবাইল ফোন ও গেজেট আসক্তি। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিড মহামারির পর থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে মাথা ব্যথা, হাত-পা ব্যথা, ঘুমের সমস্যা এবং দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকাশনা উইলির হেলথ সায়েন্স রিপোর্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫২ ভাগ শিক্ষার্থীই মনে করে তারা মানসিকভাবে বিষণ্ন এবং তাদের প্রায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া কিংবা চট করে রেগে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দেশের ২১টি জেলায় ১ হাজার ৮০৩ জন শিক্ষার্থীর ওপর এই গবেষণা চালানো হয়। ২০২০ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, মাদরাসা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর গবেষণা করা হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ৬৮ ভাগ শিক্ষার্থী দিনে ২ থেকে ৪ ঘণ্টা মোবাইলে সময় কাটাচ্ছে। ৯ ভাগ শিক্ষার্থী কম্পিউটার স্ক্রিনে ও ৮ ভাগ ট্যাবে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে। গবেষণায় আরো দেখা যায়, ২০১৮-১৯ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক সমস্যাগুলোর মধ্যে ডায়রিয়া, চুলকানির সমস্যা, পেট ব্যথা ও জ্বর সর্দি সবচেয়ে বেশি প্রকট ছিল। করোনাকালে গত দেড় বছরে মাথা ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি জটিলতা, ঘুমের সমস্যা, বিষণ্নতা ও খিটখিটে মেজাজ এবং জ্বর সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর পেছনে ঘরবন্দি হয়ে থাকা ও গেজেটের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া গেছে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে। করোনাকালে ঘরবন্দি থাকায় দেশের ৭০ ভাগ শিশুই শারীরিক কোনো কাজ বা খেলাধুলার সুযোগ পায়নি ২০২০ সালে। তাদের ৫০ ভাগ ঘরের বাইরে কোনো শারীরিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ একেবারেই পায়নি। মাত্র ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী গেজেট ব্যবহার করেছে নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের জন্য। ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী কার্টুন, নাটক ও চলচ্চিত্র দেখার কাজে, ২৭ ভাগ শিক্ষার্থী সমাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের জন্য এবং ১৭ ভাগ শিক্ষার্থী গেমস খেলার জন্য গেজেট ব্যবহার করেছে। সবচেয়ে বেশি গেজেটের ব্যবহার দেখা গেছে ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। সবচেয়ে কম দেখা গেছে, মাদরাসা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

## চরম তাপমাত্রার শহর ঢাকা : আন্তর্জাতিক গবেষণা

বিশ্বের মধ্যে বায়ুদূষণের শহর হিসেবে প্রায়ই শীর্ষে থাকা ঢাকা এবার উষ্ণতার কারণে বিশ্বের শীর্ষ চরম তাপমাত্রার শহরের তালিকায় উঠে এসেছে। একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় এমন আশঙ্কাজনক এ তথ্য উঠে এসেছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতিতে শহরগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ছে। এ দুটির প্রভাবে মারাত্মক হয়ে উঠছে সেখানকার তাপমাত্রা। এই চরম উষ্ণতার কারণে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী 'প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস'-এ ওই গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। চরম তাপমাত্রায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা প্রসঙ্গে গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৮৩ সালে এ শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪০ লাখ। কিন্তু এখন ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ বসবাস করছে এ রাজধানী শহরটিতে। চরম তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় উপরের দিকে ঠাঁই হয়েছে বাংলাদেশের। এ তালিকায় শীর্ষস্থানে ভারত, এরপরই বাংলাদেশ। চরম উষ্ণতার কারণে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোতে বসবাসরত দরিদ্র মানুষ নাগরিক সুবিধার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত। গবেষকরা ১৯৮৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা ৩৩ বছর বিশ্বের ১৩ হাজার শহরে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেসব শহরে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর থাকে, তাদেরই চরম তাপমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এরপর অন্য শহরগুলোর বাসিন্দাদের তথ্যের সঙ্গে সেগুলো তুলনা করা হয়। চরম তাপমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত শহরের তালিকায় ঢাকার পরই ভারতের দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই ও থাইল্যান্ডের ব্যাংকক। রয়েছে চীনের সাংহাই, গুয়াংজু, মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাই। এসব শহরে গত ৩২ বছরে উষ্ণতা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব ৩৭ শতাংশ, বাকি ৬৩ শতাংশের জন্য দায়ী স্থানীয় কারণ।

# আন্তর্জাতিক বিশ্ব

## ফ্রান্সে বহুসংখ্যক মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার

২০২০ সালের নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ৮৯টি মসজিদ পরিদর্শন শেষে এর এক-তৃতীয়াংশ বন্ধ করে দিয়েছে ফ্রান্স। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'বিচ্ছিন্নতাবাদবিরোধী আইন' প্রণয়নের আগে উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ৬৫০টি স্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সে সময় ফ্রান্স পুলিশ প্রায় ২৪ হাজার স্থান পরিদর্শন করে। উগ্রবাদসংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ৮৯টি মসজিদ পরিদর্শ করে ফ্রান্সের পুলিশ। এসবের এক-তৃতীয়াংশ মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও ছয়টি মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 'রাজনৈতিক ইসলাম' মতবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পাঁচটি মুসলিম সংস্থা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০৫টি সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত এবং দুই ইমামকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফ্রান্সের সরকার একের পর এক মসজিদ বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে সে দেশের মুসলিমরা বিপাকে পড়ছেন।

# মুসলিম বিশ্ব

## পূর্ব জেরুজালেমে ১০ হাজার বসতি বানাবে ইসরাঈল

ইসরাঈল সরকার অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের কালান্দিয়া এলাকার কাছে ১০ হাজার বসতি নির্মাণ করতে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাঈল নিয়ন্ত্রিত জেরুজালেম শহর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন ইয়াহূদী বসতি নির্মাণ করা হবে। ইসরাঈলের শিল্পাঞ্চল আটারোটের কাছে কালান্দিয়া এলাকায় পরিত্যক্ত জেরুজালেম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জমিতে এ ইয়াহূদী বসতি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের আগে এ জেরুজালেম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি কালান্দিয়া বিমানবন্দর নামে পরিচিত ছিল। এটা ছিল পশ্চিম তীরের একমাত্র বিমানবন্দর। কিন্তু, যখন ইসরাঈল এ অঞ্চল দখল করে তখন তারা এ বিমানবন্দরটির আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এ বিমানবন্দরটি ১৯২০ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ এ বিমানবন্দরটি চালু করে। পরে ১৯৩৬ সালে এ বিমানবন্দর থেকে নিয়মিত ফ্লাইট কার্যক্রম চালু করা হয়। এ বিমানবন্দরটি ২৯৭ একর জমিতে তৈরি। জেরুজালেম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জমিকে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে মনে করে ইসরাঈল। এ কারণে ফিলিস্তীনী জমির মালিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিবে না ইসরাঈল। যদিও জেরুজালেম বিমানবন্দরের অনেক জমির মালিক ফিলিস্তীনীরা। জেরুজালেম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ধ্বংস করে ইয়াহূদী বসতি নির্মাণ করার মানে হচ্ছে এ বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে যেন ভবিষ্যৎ ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের কোনো রাজধানী পূর্ব জেরুজালেমে গঠিত হতে না পারে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে অধিকৃত ভূখণ্ড এবং এখানে সকল ধরনের ইয়াহূদী বসতি নির্মাণ অবৈধ।

# সাইন্স ওয়ার্ল্ড

## হেপাটাইটিস সি'র নতুন ওষুধ আবিষ্কার

'হেপাটাইটিস সি' হচ্ছে একটি নীরব ঘাতক। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ শরীরে খুব কম প্রকাশ পায়। অনেক সময় ভাইরাসটি শনাক্ত করাও যায় না এবং প্রায় নীরবেই শুষে নেয় জীবনীশক্তি। তবে এই রোগের চিকিৎসা নিয়ে স্বস্তির সংবাদ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি মালয়েশিয়া 'হেপাটাইটিস সি' চিকিৎসায় সবচেয়ে কার্যকরী ও খরচের দিক দিয়ে সাশ্রয়ী একটি ওষুধকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কাছে আবেদন করেছে। জানানো হয়েছে, হেপাটাইটিস সি চিকিৎসায় ব্যবহৃত সোফোসবুভির সাথে রাভিডাসভির মেডিসিনটি যুক্ত করে অনেক ভালো সাড়া পাওয়া যায়। বিগত ৫ বছর যাবত ড্রাগস ফর নেগলেক্টেড ডিজিজ ইনিশিয়েটিভের (DNDI) সঙ্গে গবেষণার পর ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ায় মালয়েশিয়া সরকার তাদের দেশে এটিকে অনুমোদন দেয়। এখন সারা বিশ্বে একই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে অন্তত ৭১ কোটিরও বেশির মানুষ হেপাটাইটিস সি নিয়ে জীবনযাপন করছে। এটি রক্তে বাহিত হওয়া একটি ভাইরাস যা লিভার সিরোসিসের দিকে নিয়ে যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে। এই ভাইরাস লিভার ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। এখন পর্যন্ত এই রোগের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি কারণ এই রোগের কোনো লক্ষণই ধরা পড়ে না। যখন ধরা পড়ে ততক্ষণে লিভার গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১১ লাখ মানুষ মারা গেছেন। বাংলাদেশেও হেপাটাইটিস রোগটির প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১ কোটি হেপাটাইটিস বি ও সি রোগী রয়েছে।

# সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

## ঈমান-আক্বীদা– রিযিক্ব

**প্রশ্ন (১) : আমরা জানি আমাদের রিযিক্ব পূর্ব নির্ধারিত। এখন ধরে নিই একজন ব্যক্তি দুনিয়াতে সূদী ব্যাংকে চাকুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এর অর্থ এ রকম নয় কি যে, আল্লাহ তাআলা তার ভাগ্যে ঐ রুযী লিখে রেখেছেন বলে সে তা উপার্জন করছে?**

-নিবির হাসান

শাজাহানপুর, বগুড়া।

**উত্তর :** প্রত্যেক প্রাণীর রিযিক্ব পূর্ব নির্ধারিত একথাই ঠিক। তবে আল্লাহ রিযিক্ব অন্বেষণের বৈধ ও অবৈধ পথ ও পন্থা কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫২)। সুতরাং বান্দা তার নির্ধারিত রিযিক্ব বৈধ পন্থায় অন্বেষণ করবে না অবৈধ পন্থায় অন্বেষণ করবে তা তার ইচ্ছাধীন রয়েছে। যদি সে বৈধ পন্থায় অন্বেষণ করে, তাহলে তা তার জন্য হালাল রিযিক্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি অবৈধ পন্থায় অন্বেষণ করে, তাহলে তা হারাম রিযিক্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। এই মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো দেহ তার (নির্ধারিত) রিযিক্ব পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ধন-সম্পদ উপার্জনে উত্তম (বৈধ) নীতি অবলম্বন করো। কাঙ্ক্ষিত রিযিক্ব পৌঁছার বিলম্বতা যেন তোমাদের আল্লাহর অবাধ্যতার পথে তা অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ না করে (মিশকাত, হা/৫৩০০)। অপর বর্ণনায় রয়েছে- يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ 'হে মানুষ সকল! তোমরা ধন-সম্পদ উপার্জনে উত্তম নীতি অবলম্বন করো। যা হালাল তা গ্রহণ করো আর যা হারাম তা বর্জন করো (সুনানূল কুবরা বায়হাক্বী, হা/১০৭০৮)। অতএব হারাম পথে উপার্জন করে, বিষয়টি আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। বরং ব্যক্তি হারাম পথ ছেড়ে দিয়ে বৈধ পথে রিযিক্ব অন্বেষণ করবে।

**প্রশ্ন (২) : আল্লাহ তাআলা যে আমাদের রিযিক্ব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সেটা কি আমাদের চেষ্টা বা কৃতকর্মের উপরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, নাকি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?**

-মোহাইমিনুল ইসলাম শুভ

আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

**উত্তর :** রিযিক্ব বণ্টন বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে কর্মে উপর নয়। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যে, তার রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি' (হুদ, ৬)। আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব লিখে রেখেছেন, এমনকি রিযিক্বও। একদা উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার ছেলেকে বললেন, হে আমার প্রিয়পুত্র! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না; যতক্ষণ না তুমি বিশ্বাস করবে যে, 'যা তোমার উপর ঘটেছে তা ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিলো না। পক্ষান্তরে, যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ভুলেও ঘটবার ছিলো না'। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লিখো! কলম বলল, হে রব! কী লিখব? তিনি বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাক্বদীর লিখো। হে আমার প্রিয়পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা যায় সে আমার (উম্মাতের) দলভুক্ত নয় (আবূ দাউদ, হা/৪৭০০; তিরমিযী, হা/২১৫৫)। অতঃপর আবার সন্তান মাতৃগর্ভে আসার চার মাস পর নতুনভাবে আল্লাহ তাআলা তার নির্ধারিত রিযিক্ব লিপিবদ্ধ করে দেন। যায়েদ ইবনু ওহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফেরেশতাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিযিক্ব, তার জীবনকাল এবং সে পাপী হবে না কি পূণ্যবান হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯৩)। উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার রিযিক্ব আল্লাহর উচ্ছানুযায়ী পূর্ব হতে নির্ধারিত।

## ঈমান-আক্বীদা– মৃত্যু

**প্রশ্ন (৩) : যারা নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে আল্লাহর আসনে বসায় তাদের মুসলিম বলা যাবে কি?**

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করা এবং তাঁকে আল্লাহর আসনে বসানো কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং ছাহাবীসহ সকল আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা পরিপন্থি বিশ্বাস। সুতরাং তাদের মুসলিম বলা যাবে না; তারা কাফের। কারণ **এক.** নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে'। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল বৈ কিছু নয়, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে'? (আলে-ইমরান, ১৪৪)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু হলে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু সকল ছাহাবীর সামনে বললেন, মুনাফিকদের নিঃশেষ না করা পর্যন্ত আল্লাহর নবীর মৃত্যু হতে পারে না। একথা আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু শুনতে পেয়ে বললেন, 'যারা আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা জেনে রাখো! আল্লাহ চিরঞ্জীব তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা মুহাম্মাদের দাসত্ব করো তারা জেনে রাখো! নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/১২৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৫৯২)। উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু হয়েছে এবং ছাহাবীগণেরও আক্বীদা তাই ছিল। **দুই.** নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর আসনে বসানোর অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহর গুণাবলি এবং জাতি-সত্তায় অংশীদারত্ব স্থাপন করা। যেমন, আল্লাহ যা করতে পারেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাই করতে পারেন। আল্লাহও গায়েব জানেন মুহাম্মাদও জানেন, আল্লাহ জীবন-মৃত্যুর মালিক মুহাম্মাদও জীবন-মৃত্যুর মালিক ইত্যাদি, তাহলে এটা শিরক হবে এবং এমন বিশ্বাস লালনকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। খ্রিস্টানরা যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর আসনে বসানোর কারণে কাফের হয়েছে ঠিক তদ্রূপ যারা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর আসনে বসাবে তারাও একই কারণে কাফের হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা কাফের যারা বলে যে, মরিয়ম পুত্র মসীহ-ই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেন, 'হে বণী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম' (আল-মায়েদা, ৭২)। সুতরাং মুসলিম হতে হলে এমন আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি।

**প্রশ্ন : (৪) বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের কোনো মানুষ নিজেকে নবীর বংশধর দাবী করতে পারে কি?**

-নাহাল গালীব
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** শুধু বাংলোদেশ নয় বরং বিশ্বের কেউ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া নিজেকে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর দাবী করতে পারবে না। ভারত, বাংলাদেশের অনেক মানুষ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেকে أَوْلَادُ الرَّسُوْلْ বা নবীর বংশধর দাবী করতে দেখা যায়। এটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবী মাত্র। এমন দাবী করা ইসলামে হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সত্য আঁকড়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস করলে ও সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হলে, আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ (নিশ্চিত জাহান্নামের) অগ্নির দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৭; মিশকাত, হা/৪৮২৪)। তবে সত্যিকার অর্থে প্রকৃত বংশনামা প্রমাণিত থাকলে এবং স্বীকৃত থাকলে দাবী করতে পারে। যেমন বর্তমানে জর্দানের শাসকগণ সকলের নিকট বানু হাশিম গোত্রের হিসেবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূলের বংশনামা শুধু আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার সুযোগ নাই; বরং আলে আব্বাস, আলে জাফর, আলে হারিস, আলে আক্বীল সকলেই আলে রাসূলের অর্ন্তভুক্ত। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত বংশধরদের জন্য যাকাত হারাম।

## পবিত্রতা-ওযূ-গোসল

**প্রশ্ন (৫) : মোজা মাসাহ করে একদিনের বেশি ছালাত আদায় করা যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, একদিনের সময়সীমা কখন হতে শুরু হবে?**

-আহম্মেদ বিন মনির
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

**উত্তর :** শারয়ী বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি ওযূ করে মোজা পরিধান করে, তাহলে সে মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। মোজার উপর মাসাহ করার সময়সীমা শরীয়তে নির্ধারিত। ব্যক্তি যদি মুক্বীম হয়, তাহলে একদিন একরাত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। আর ব্যক্তি যদি মুসাফির হয় তাহলে তিনদিন তিনরাত তথা ৭২ ঘণ্টা মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। আলি (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন' (নাসাঈ, হা/১২৮; মিশকাত, হা/৫১৭ 'হাদীছ ছহীহ')। তবে মোজার উপর মাসাহ করার সময় আরম্ভ হবে ওযূ করে মোজা পরিধান করার পর প্রথম যখন ওযূ ভঙ্গ হবে তখন থেকে। মোজা পরিধান করার সময় থেকে নয় (শরহুন নববী, ১৩৫ পৃ.)।

**প্রশ্ন (৬) : টয়লেটের মশা-মাছি কাপড়ে বা শরীরে বসলে তা নাপাক হয়ে যাবে কি?**

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** প্রথমত, টয়লেটের মশা-মাছির শরীরে যে নাপাকি লেগে থাকে তা নিতান্তই সামান্য। যা চোখে দেখা বা বোঝা যায় না। আর সকল মশা-মাছির শরীরে নাপাকি লেগে থাকে বিষয়টিও অনিশ্চিত। সুতরাং পেশাব-পায়খানা বা টয়লেটের মশা-মাছি কাপড়ে বা শরীরে বসলে, শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না। দ্বিতীয়ত, মশা-মাছি সাধারণত মানুষের শরীরে বসেই থাকে। সুতরাং মশা-মাছির শরীরে লেগে থাকা নাপাকী হতে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য সাধ্যাতীত বিষয়। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের সাধ্যের বাহিরে কোনো কিছু অর্পণ করেননি (আল-বাক্বারা, ২৮৬)। উল্লেখ্য যে, খাবারে মাছি পড়লে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মাছিকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়ে তা খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮২; মিশকাত, হা/৪১৪৩)। এখানে মাছি কোথা হতে আসল তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদি মাছি বসার কারণে কোনো কিছু নাপাক হয়ে যেতো, তাহলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন খাবার খাওয়ার অনুমতি দিতেন না। এ থেকে বোঝা যায়, শুধু মাছি বসার কারণে কোনো কিছু নাপাক হয় না।

**প্রশ্ন (৭) : মনের সন্দেহজনিত কারণে পুনরায় মাথা মাসাহ করলে ওযূ হবে কি?**

-রফিকুল ইসলাম
মহব্বত বাজিতপাড়া, থানা ও জেলা নীলফামারী।

**উত্তর :** ১. ওযূ সম্পন্ন হওয়ার পর যদি মনে এমন সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে এমন সন্দেহ শরীয়তে ধর্তব্য নয় এবং এর জন্য কোনো করণীয় নেই। ওযূ হয়ে যাবে। ২. ওযূ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই যদি মনে এমন সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তা প্রবল হয়, তাহলে মাথা মাসাহ করে নিবে।

উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি যদি مشكوك তথা 'অধিক সন্দেহগ্রস্ত' হয় তাহলে এমন ব্যক্তি সন্দেহের তোয়াক্কা করবে না। (ফতওয়া সয়াল ওয়া জাওয়াব, ১/৩৩৭)।

**প্রশ্ন (৮) : ওযূ শেষে কালিমা শাহাদাত পড়তে ভুলে গেলে ওযূ হবে কি?**

-রফিকুল ইসলাম
মহব্বত বাজিতপাড়া, থানা ও জেলা নীলফামারী।

**উত্তর :** ওযূর শেষে দু'আ পাঠের ফযিলত অনেক। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য এ বিষয়ে মনযোগী হওয়া জরুরি। ওযূর শেষের দু'আ সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযূ করে বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪; মিশকাত, হা/২৮৯)। তবে কেউ যদি ওযূর শেষে উক্ত দু'আ না পড়ে, তাহলে তার ওযূ হয়ে যাবে। তবে ওযূর দু'আর ফযিলত থেকে বঞ্চিত হবে।

## হালাল-হারাম

**প্রশ্ন : (৯) আমরা ছয় ভাই-বোন। আমার বাবা পাঁচ ভাই-বোনের অনুমতি নিয়েই আমার জন্য কিছু জমি দিয়েছেন। এটা কি আমার জন্য হালাল হবে?**

-দেলোয়ার
পাবনা।

**উত্তর:** বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় সন্তানরা সম্পদের মালিক হয় না। যেহেতু বাবার জীবদ্দশায় ছেলে-মেয়েরা সম্পদের অংশের মালিক হয়নি, তাই ভাই-বোনদের এই সম্পদ ছেড়ে দেওয়া শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বাবার মৃত্যুর পর সন্তানরা চাইলে নিজের প্রাপ্য অংশ বোন বা অন্য কাউকে দিলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে যাকাতের সম্পদ হতে কিছু সম্পদ দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে দিন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি নিজের সম্পদ বানিয়ে নাও অতঃপর চাইলে অন্যকে দান করে দাও (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৬৩)।

**প্রশ্ন (১০) : হস্তমৈথুন কি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ? নাকি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সেটা বৈধ? যদি স্ত্রীর মাসিক অবস্থার কথা ধরা হয়।**

-মিম
রংপুর।

**উত্তর :** হস্তমৈথুন অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত কাজ। স্ত্রী ও দাসীর সাথে বৈধ পন্থায় যৌনসঙ্গম ব্যতীত অন্য সকল পথ ও পদ্ধতি হারাম। যারা একাজে অভ্যস্থ তারা সফলতা লাভ করবে না এবং বড় গুণাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, অবশ্যই সফলকাম হয়েছে ঐ সকল মুমিন যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। বিবাহিত স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত কোথাও ব্যবহার করে না। আর অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী (আল-মুমিনূন, ৫-৭; আল-মা'আরিজ, ২৯)।

## ব্যবসা-বাণিজ্য- সূদী কারবার

**প্রশ্ন (১১) : কোনো (বিবাহিত/অবিবাহিত) নারীর পিতা যদি সূদভিত্তিক লোন নিয়ে বাড়ি তৈরী করেন, তাহলে সেই বাড়িতে বসবাস করা কি তার জন্য জায়েয? যদি জায়েয না হয়, তাহলে এর জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা কি যাবে?**

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কবিরহাট, নোয়াখালী।

**উত্তর :** ব্যাংক হতে সূদভিত্তিক লোন নিয়ে গাড়ি-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করা যাবে না। কেননা সূদ সুস্পষ্ট হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের সংবাদ জেনে নাও' (আল-বাক্বারা, ২৭৮-৭৯)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২৭৫)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ সূদগ্রহণকারী ও সূদপ্রদানকারী এবং সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। এমতাবস্থায় সূদমুক্ত হয়ে বিগত সূদের পাপের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যেহেতু তৈরিকৃত বাড়ি ভেঙ্গে ফেললে অর্থ নষ্ট হবে, তাই সম্ভব হলে নেকীর আশা ছাড়াই বাড়িটি দান করে দিতে হবে। নিরুপায় হলে বসবাস করতে পারে। আর উপায় থাকলে স্বামীসহ অন্য কোথাও বসবাস করবে। তবে এর জন্য পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না।

**প্রশ্ন (১২) : বাংলাদেশে শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে টাকা রেখে ল্যভাংশ নিলে তা সূদ হবে কি?**

-মোস্তাফিজুর রহমান
শিরোইল, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।

**উত্তর :** ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হয়। আর বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি সূদের সাথে জড়িত। অতএব ইসলামী ব্যাংক হতে প্রদত্ত লভ্যাংশও সূদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ইসলামী শরীয়াতে সূদ হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসা হালল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২৭৫)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ সূদগ্রহণকারী ও সূদপ্রদানকারী এবং সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। আর সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে বলেন, مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ 'যে সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত করল সে তার সম্মান ও দ্বীনকে রক্ষা করল। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়াল সে হারামে পতিত হলো' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯)। অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমার কাছে যা সন্দেহ মনে হয় তা পরিত্যাগ করো এবং সন্দেহ মুক্ত জিনিস গ্রহণ করো (নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩)।

**প্রশ্ন (১৩) : ফরেক্স ট্রেডিং (Forex Trading) কি হালাল?**

-জালাল উদ্দিন
ভদ্রখণ্ড, তানোর, রাজশাহী।

**উত্তর :** ফরেক্স ট্রেডিং মূলত একদেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রা এক্সচেঞ্জ করার মাধ্যমে আয় করা। এখানে ব্রোকারের মাধ্যমে অনলাইনে অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করা যায়। এই অ্যাকউন্ট সূদমুক্ত করার সুযোগ আছে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা থাকে, বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকে, মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত থাকে, একই দেশের মুদ্রা বিনিময় হয় না, বরং ভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় হয়, পাশাপাশি উভয়পক্ষ অ্যাকাউন্ট থেকে সাথে সাথে মুদ্রা আদান-প্রদানের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে, যা শরীআতের মূলনীতি 'হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ- সমপরিমাণ ও হাতে হাতে (নগদে) হতে হবে। তবে এই দ্রব্যগুলো যদি একটি অন্যটির সাথে বিনিময় হয়

(অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তাহলে তোমরা যেরূপ ইচ্ছা (কম-বেশিতে বিক্রি) করতে পার, তা হাতে হাতে (নগদে) হলে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৭)। 'উভয়পক্ষ অ্যাকাউন্ট থেকে সাথে সাথে মুদ্রা আদান-প্রদানের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করাটা 'মজলিসে লেনদেন সম্পন্ন হওয়া'র স্থলাভিষিক্ত। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ফরেক্স ট্রেডিংয়ে হালালভাবে উপার্জনের সুযোগ রয়েছে।

**প্রশ্ন (১৪) : আমি একজন ফুল বিক্রেতা। বিভিন্ন দিবস ও উৎসব পালনের দিন মানুষ আমার থেকে ফুল ক্রয় করে। তাদের কাছে আমার ফুল বিক্রয় করা ঠিক হবে কি?**

-আশরাফুল ইসলাম

শ্রীপুর, মাগুরা।

**উত্তর :** প্রত্যেক হালাল ও বৈধ পণ্যের ব্যবসা করাতে শারয়ী কোনো বাধা নেই। ফুলও একটি বৈধ পণ্য। সুতরাং ফুল বিক্রয় করা যায়। কেউ যদি কামারের নিকট থেকে কোনো ধারালো অস্ত্র ক্রয় করে তা দ্বারা কোনো হত্যাযজ্ঞ ঘটায়, তাহলে এই হত্যার জন্য যেমন কামার দায়ী নয়। ঠিক তদ্রূপ ফুল বিক্রেতার নিকট হতে ফুল ক্রয় করে যদি কেউ তা অবৈধ কাজে ব্যবহার করে, তাহলে তার জন্য ফুল বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকবে না। বরং অবৈধ কাজে ব্যবহারকারী এর জন্য আল্লাহর নিকট পাপী হবে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না' (ফাতির, ১৮)। তবে স্পষ্ট জানতে পারলে তার নিকট বিক্রয় করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরস্পর ভালো এবং তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ২)।

**প্রশ্ন (১৫) : হিন্দুধর্মের লোকদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করা যাবে কি?**

-মুসলিম আহমেদ ইমন

লাউহাটী, দেলদুয়ার, টাংগাইল।

**উত্তর :** হিন্দুধর্মসহ যেকোনো ধর্মের মানুষের সাথে হালাল ও বৈধ জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করাতে শারয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক ইয়াহুদী থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহবর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২০৬৮; মিশকাত, হা/২৮৮৪)।

## ইবাদত- ছালাত- পঠিতব্য দু'আ

**প্রশ্ন (১৬) : স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?**

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম

পত্নীতলা, নওগাঁ।

**উত্তর :** স্বামী-স্ত্রী ও যেকোনো নারী-পুরুষ এক কাতারে পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে না। বরং নারীকে পিছনেই দাঁড়াতে হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইয়াতীম রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন। (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭; মিশকাত, হা/১১০৮)।

**প্রশ্ন (১৭) : আমার ভোলা জেলার অধিকাংশ মানুষ মাযহাবী তরীকায় ছালাত আদায় করে। আমি ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার বাবা ও অন্যান্যরা আমাকে নিষেধ করে। এমতাবস্থায় আমি বাবার কথা না মানলে তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে গণ্য হব কি?**

-শাহীন

চরফ্যাশন, ভোলা।

**উত্তর :** সঠিক ও বিদ'আতমুক্ত আমল বৈ কোনো আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যারা আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেখানো পদ্ধতির অনুসরণ করে না; তাদের আমল আল্লাহর নিকট বাতিল। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করো না' (মুহাম্মাদ, ৩৩)। ছালাত রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। মালেক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي অর্থাৎ 'তোমরা ছালাত আদায় করো; যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১; মিশকাত, হা/৬৮৩)। অতএব এমন পরিস্থিতিতে সুন্নাহ পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতে হবে। মা-বাবাকে বিষয়টি আদবের সহিত বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাদের সাথে অসাদাচরণ করা যাবে না। তবে কারো কথায় রাসূলের সুন্নাহকে ত্যাগ করা যাবে না। নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই (মিশকাত, হা/৩৬৯৬)। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে না।

**প্রশ্ন (১৮) : বিতরের কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে পড়তে হবে?**

-হারুনুর রশীদ
বদরগঞ্জ, রংপুর।

**উত্তর :** বিতরের কুনূত পড়ার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে- **এক.** ক্বিরাআত শেষ করে রুকুর পূর্বে হাত বাঁধা অবস্থায় দু'আয়ে কুনূত পড়া। (ইরওয়াউল গালীল, আলবানী হা/২৫৩; আলোচনা দ্র. ২/৭১ পৃ. ২/১৮১ পৃ.)। **দুই.** রুকুর পর দুই হাত তুলে দু'আ কুনূত পড়া। উবায় ইবনু কাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক'আত বিতর ছালাত আদায় করতেন প্রথম রাকা'আতে সূরা আলা দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। আর তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। (নাসাঈ, ১৬৯৯ ১/১৯১ পৃ. সনদ ছহীহ)। অন্য হাদীছে এসেছে। উবায় ইবনু কাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিতর পড়তেন তখন রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। (ইবনু মাজাহ, হা/১১৮২ পৃ. সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪২৬)।

**প্রশ্ন (১৯) : মসজিদের বাউন্ডারির ভিতরে অথবা, সামনে-পিছনে কিংবা ডানে-বামে কবর থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে কি?**

-সাইফুল ইসলাম
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

**উত্তর :** মসজিদের বাউন্ডারির ভিতরে, মসজিদের ডানে-বামে অথবা সামনে পিছনে কবর থাকলে, সে মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা এমন মসজিদ কবরস্থানের অন্তর্ভুক্ত। আর কবর স্থানে ছালাত আদায় করা হারাম। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গায় মসজিদ (তিরমিযী, হা/৩১৭; ইবনু মাজাহ, হা/৭৪৫; মিশকাত, হা/৭৩৭)। আবূ মারছাদ আল-গানাভী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের উপর ছালাত আদায় করো না (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৫৫)। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে 'কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (মুসনাদে বাযযার, হা/৪৪১)। যারা কবরস্থানকে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, 'আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩০; মিশকাত, হা/৭১২)। তবে যদি কবর মসজিদের পার্শ্বে হয় এবং প্রাচীর দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মসজিদ থেকে কবরকে পৃথক করা হয়, তাহলে সে মসজিদে ছালাত বৈধ হবে (মাজমুউল ফতওয়া 'ইবনু তাইমিয়্যা', ৩১/১২ পৃ. মাজমুউল ফতওয়া 'ইবনু বা'য, ১৩/৩৫৭ পৃ.)।

**প্রশ্ন (২০) : ছালাতরত অবস্থায় কেউ কথা বললে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?**

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কথা বললে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। যায়েদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ছালাতে কথা-বার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে কথা বলত। অতঃপর যখন قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'আর তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত ও একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও' (আল-বাক্বারা, ২৩৮) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন ছালাতে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে কথা বলতে নিষেধ করা হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১২৩১; ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৪)। তবে অনিচ্ছাকৃত কিংবা অজ্ঞতাবশত কথা বলে ফেললে ছালাত হয়ে যাবে। মুয়াবিয়া বিন হাকাম নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত পড়ছিলেন, লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর الحمد لله বললে, তার হাঁচির প্রত্যুত্তরে তিনি يَرْحَمُكَ اللهُ বললেন, ছালাত শেষে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ অর্থাৎ ছালাতের মধ্যে কথা-বার্তা ধরনের কোনো কিছু বলা উচিত নয়। বরং ছালাতে প্রয়োজনীয় তাসবীহ, তাকবীর বা কুরআন পাঠ করতে হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭; মিশকাত, হা/৯৭৮)। উক্ত ঘটনায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলার কারণে সর্তক করেছেন। তবে পুনরায় ছালাত পড়তে বলেননি।

**প্রশ্ন (২১) : মসজিদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি জায়গায় মহিলাদের জুম'আর ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এভাবে তাদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?**

-আব্দুল্লাহ
দিনাজপুর।

**উত্তর :** এভাবে ছালাত জায়েয হবে না। কারণ তারা ইমামের সামনে রয়েছে। আর ইমামের সামনে মুসল্লির দাঁড়ানো জায়েয



www.al-itisam.com

নয়। তবে ডানে, বামে, পিছনে দাঁড়ালে জায়েয হবে। শরীয়তের নিয়ম হলো যে, মহিলারা পুরুষের পিছনে ছালাত আদায় করবে। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তার দাদী রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে খাবারের দাওয়াত করলেন যা তিনি তার জন্য তৈরি করেছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তা হতে খেলেন এবং বললেন, 'তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াও আমি তোমাদের ছালাত পড়াব। রাবী বলেন, আমি দাঁড়ালাম ও ছোট ভাই ইয়াতীম তার পিছনে দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পিছনে দাঁড়াল। এরপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৮)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারা পিছনে ছালাত আদায় করবে। তবে যদি তেমন জায়গা না থাকে তাহলে ডানে-বামে ছালাত আদায় করতে পারে (মাজমূআয়ে ফতওয়া ইবনু উছায়মীন, ১৩/৪৪) এবং পুরুষের পাশে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অবশ্যই উভয়ের মাঝে দেওয়াল বা প্রতিবন্ধকতামূলক কিছু দিতে হবে। এমন অবস্থায় ঐক্যমতে ছালাত বৈধ হবে (তাবয়ীনুল হাকায়েক্ব, ১/১৩৮)।

**প্রশ্ন : (২২) ফরয ছালাতের পরে যে সকল যিকির-আযকার পাঠ করা হয় সেগুলো কি সুন্নাত বা নফল ছালাতের পরেও পাঠ যাবে?**

-শাহরিয়ার
গুরুদাসপুর, নাটোর।

**উত্তর :** ফরয, নফল সকল ছালাতের পর হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করা যায়। ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন ছালাত হতে সালাম ফেরাতেন তখন তিনবার 'আসতাগফিরুল্ল-হ' পাঠ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯১)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ 'প্রত্যেক ছালাতের পর যখন সালাম ফেরাতেন তখন পাঠ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৩০)। উল্লেখ্য যে, যিকিরের বিষয়টি কিছু কিছু হাদীছ দ্বারা ফরয ছালাতের খাছ করা হলেও একাধিক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয নফল সকল ছালাতের পর পাঠ করা যায়।

## ইবাদত-যাকাত-ছাদাক্বা

**প্রশ্ন (২৩) : আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার গরু ও ছাগলের খামার আছে। মাঝে মাঝে আমি গরু ও ছাগল কিনি আবার বিক্রি করি। এমতাবস্থায় আমাকে কি এগুলোর যাকাত বের করতে হবে?**

-আব্দুল্লাহ ওমর
সাঁথিয়া, পাবনা।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত গরু-ছাগল ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ 'আসবাবপত্রের উপর কোনো যাকাত নেই। তবে যদি তা ব্যবসার পণ্য হয়ে থাকে (তাহলে সেই আসবাবপত্রের উপর যাকাত ফরয হবে) (মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাক্বী, হা/ ২৫০৯)। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত। ১. নিসাব পরিমাণ হওয়া ২. পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করা। যাকাতের নিসাব হলো- ৭.৫ ভরি স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির ব্যবসায়িক পণ্যের পরিমাণ যদি ৭.৫২ ভরি স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য সমপরিমাণ হয়, তাহলে সেই ব্যবসায়িক পণ্যের মোট হিসাবের উপর ২.৫% যাকাত আদায় করতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩; বুলূগুল মারাম, হা/৪৮৭)। । উল্লেখ্য যে, প্রাণী যদি চারণভূমিতে বিচরণশীল না হয় তাহলে ব্যবসায়ী সম্পদের হিসাবে যাকাত গ্রহণ করা হবে, প্রাণীর যাকাতের হিসাবে নয়। সুতরাং উক্ত ব্যবসায়ীকে যাকাত বের করার দিন তার নিকট যত টাকা মূল্যের গরু-ছাগল আছে সেই মূল্যের উপর যাকাত নির্ধারণ করে যাকাত বের করতে হবে

**প্রশ্ন (২৪) : ভাই কি তার অস্বচ্ছল বোনকে যাকাত দিতে পারবে?**

-আলামিন
কাটাখালি, রাজশাহী।

**উত্তর :** হ্যাঁ; বোন যদি অসহায় হয় তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়। বরং অসহায় বোনকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব হবে। সালমান ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ '(অনাত্মীয়) মিসকীনকে দান করলে দান করার একটি ছওয়াব হয়। কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দুটি ছওয়াব হয়; দান করার ছওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ছওয়াব' (তিরমিযী, হা/২৫৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৯০৯)।

**প্রশ্ন (২৫) : আমার স্ত্রী একজন নওমুসলিম। তার বাবা-মার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সে কি তার পরিবারের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ রাখতে পারবে? সাথে সাথে আমি কি যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারব?**

-শাহিনুর আলম
লামা, বান্দরবান, চট্টগ্রাম।

**উত্তর :** মা-বাবা মুসলিম হোক বা অমুসলিম তাদের সাথে সদা

সদাচরণ করতে হবে। মা-বাবার সাথে সদাচরণের আদেশ করে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার করো’ (আল-ইসরা, ২৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, ‘পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে অংশী করতে পিড়াপিড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মান্য করবে না, অবশ্য পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদভাবে বসবাস কর’ (লুকমান, ১৫)। অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের কথা মান্য করা যাবে না (মিশকাত, হা/৩৬৯৬)। আসমা বিনতু আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফাতাওয়া চেয়ে বললাম, আমার মা আমার নিকট এসেছেন। সে আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করো (ছহীহ বুখারী, হা/২৬২০)। অভাবগ্রস্ত শ্বশুর-শাশুড়িকে সহযোগিতা করা তাদের সাথে সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদের মনজয়ের জন্য যাকাত দেওয়ার আলাদা খাতই বর্ণিত হয়েছে । সুতরাং অভাবগ্রস্ত অমুসলিম শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে যাকাত দেওয়া যাবে।

**প্রশ্ন (২৬) : বসবাসের জন্য তৈরিকৃত বাড়ি যদি প্রয়োজনের তাগিদে ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে ঐ বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থের যাকাত দিতে হবে কি?**

-ফারহান সাদিক রাফিদ

২৪৩/৬, নিমতলা, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা-১২০৯।

**উত্তর :** বসবাসের জন্য তৈরিকৃত বাড়ির উপর কোনো যাকাত নেই। তবে যদি বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় এবং তা হতে উপার্জিত অর্থ নেসাব পরিমাণ হয় এবং উক্ত নেসাবের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে সেই বাড়ি হতে উপার্জিত ভাড়ার টাকায় শতকরা ২.৫ ভাগ হারে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা যেকোনো বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে সেই অর্থেই যাকাত ফরয (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩; বুলূগুল মারাম, হা/৪৮৭ ছহীহ সনদে; ফতওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৩৭০)। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ভাড়া হতে উপার্জিত অর্থ ও নিজের জমাকৃত টাকাসহ যদি যাকাত পরিমাণ হয় তাহলে সব টাকা হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

**প্রশ্ন (২৭) : খামারে পালিত গরুর যাকাত দিতে হবে কি? যদি তাতে বছর পূর্ণ না হয় তাহলে করণীয় কী?**

আবুল বাসার

গ্রাম কল্লবাস। থানা বি,পাড়, কুমিল্লা।

**উত্তর :** যাকাতযোগ্য গৃহ পালিত পশুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে- **১.** নেসাব পরিমাণ হওয়া **২.** পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা **৩.** সায়েমা (বিচরণশীল) হওয়া। খামারে পালিত গরুর মধ্যে তৃতীয় শর্তটি বিদ্যমান না থাকায় এমন পশুতে যাকাত ফরয হবে না। তবে যদি খামারের পশু ব্যবসার উদ্দেশ্যে লাল-পালন করা হয় তাহলে সেই পশু ব্যবসায় সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ খামারের সকল পশুর মূল্য হিসাব করে যদি ৫২.৫ তোলা রোপ্য বা ৭.৫ ভরি স্বর্ণের মূল্য সমপরিমাণ হয় তাহলে বৎসরান্তে সেই পশুর মোট মূল্যের উপর শতকরা ২.৫ ভাগ হারে যাকাত ফরয হবে। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম মজুদ থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোনো ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত মজুদ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশি হয়, তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যবসায় পণ্যের মধ্য হতে যাকাত বের করার জন্য আমাদের আদেশ করতেন (বুলূগুল মারাম, হা/৬২৩)।

**প্রশ্ন (২৮) : আমার বেশ কিছু টাকা ঋণ আছে। তা পরিশোধ করার জন্য অল্প অল্প করে একাউন্টে জমা রাখছি। কেননা পাওনাদার যেকোনো মুহূর্তে তা চাইতে পারেন। এমতাবস্থায় জমাকৃত টাকার উপরে যদি বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে কি তার যাকাত দিতে হবে?**

-সাইফুল্লাহ

রায়পুর, লক্ষীপুর।

**উত্তর :** যেকোনো যাকাতযোগ্য সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং এক বছর অতিক্রম করলে যাকাতযোগ্য সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়। তাই এমতাবস্থায় যাকাত বের করার সময় হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় বছরান্তে যাকাতের হিসেবের মধ্যে উক্ত টাকাও গণ্য হবে।

সায়েব ইবনু ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, উছমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলতেন, এই মাস (মাহে রামাযান) যাকাত আদায়ের মাস। ঋণগ্রস্তদের উচিত তাদের ঋণ শোধ করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করে নেওয়া যায় (মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/৮৭৩)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ না করে দেয় তাহলে বছরান্তে যাকাত বের করতে হবে।

**প্রশ্ন (২৯) : আমার একটা ডিপিএস-এর মেয়াদ এ বছর শেষ হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই টাকাগুলো আমার ব্যাংক একাউন্টে জমা হওয়ার কথা। কিন্তু লকডাউনের কারণে তা একাউন্টে জমা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমি যখন যাকাতের টাকার পরিমাণ হিসাব করব তখন পর্যন্তও যদি টাকাগুলো একাউন্টে জমা না হয় সে ক্ষেত্রেও কি যে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা হওয়ার কথা সে পরিমাণ টাকা ধরে যাকাত বের করব, না-কি তা একাউন্টে জমা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব?**

-সৈয়দা নাজনীন আক্তার
৭১৪ পূর্ব মানিকদী, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ১২০৬।

**উত্তর :** ডিপিএস এর মাধ্যমে সম্পদ জমানো স্পষ্ট সূদ, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম (আল বাক্বারা, ২৭৫)। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধনের যাকাত দিতে হবে। তবে অতিরিক্ত সূদের কোনো যাকাত হবে না। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব হারাম থেকে মুক্তিলাভের জন্য নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়া সূদের অতিরিক্ত লাভকে জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দিতে হবে। আমরা জানি যাকাত দিতে হয় হালাল সম্পদকে পবিত্র করার জন্য। আর সূদের মাল তো পুরোটাই হারাম। তাকে পবিত্র করার কি আছে?।

**প্রশ্ন : (৩০) অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে হবে কি?**

-আব্দুর রহমান
কুরপার, পুলিশ লাইন, নেত্রকোনা।

**উত্তর :** যাকাতযোগ্য সম্পদ হতে যাকাত বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- **এক.** গরীব-দুখী মানুষের অধিকার প্রদান করা বা দারিদ্র্য বিমোচন। **দুই.** নিজেকে ও নিজ সম্পদকে পবিত্র করা। এমতাবস্থায় সম্পদের যাকাত বের করতে হবে একথাই ঠিক। তবে ব্যক্তিকে এমন মনে রাখতে হবে যে, হারাম সম্পদের যাকাত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। এমন ব্যক্তিকে তার হারাম সম্পদ নেকীর আশা ছাড়াই জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে এবং হারাম হতে বেঁচে থাকতে হবে। আর যাকাত শুধু হালাল সম্পদেরই আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন (৩১) : আমরা যৌথ পরিবারে বসবাস করি। তাই আমার মায়ের স্বর্ণ, স্ত্রীর স্বর্ণ, এবং ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর স্বর্ণ মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে কি যাকাত দিতে পারবে?**

-ওয়াসিম আকরাম
বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

**উত্তর : একই পরিবারে বসবাস করলেও সকলের ইনকাম যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে** যাকাত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আলাদা আলাদাভাবে ফরয হবে। একাধিক মালিকানাভুক্ত সম্পদকে যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্যে একত্র করা যাবে না। যেমনভাবে একই মালিকানাভুক্ত সম্পদকে যাকাত প্রদানের ভয়ে ভিন্ন করা যাবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ 'যাকাত আদায়ের ভয়ে পৃথক পৃথক সম্পদকে একীভূত করা যাবে না এবং একীভূত সম্পদকে পৃথক করা যাবে না (আবূ দাউদ, হা/১৫৮০, ১৫৭২)। সুতরাং ব্যক্তি যখন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে এবং এক বছর অতিক্রম করবে, তখনই তার উপর যাকাত ফরয হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় করো এবং যাকাত দাও' (আল-বাক্বারা, ২/৪৩)।

**প্রশ্ন (৩২) : কী পরিমাণ জমির ফসলে উশর দিতে হয়? আমাদের দুই একর জমি আছে? তাতে উৎপাদিত ফসলের কি উশর দিতে হবে?**

-সৌরভ
লালমণিরহাট।

**উত্তর :** ফসলের যাকাতের নিছাব হলো পাঁচ অসাক্ব (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯)। কিলোগ্রামের মাপে যার পরিমাণ হলো ১৮ মণ ৩০ কেজি। এতে জমির পরিমাপ বিবেচ্য নয়, বরং ফসলের পরিমাণ বিবেচ্য। উৎপাদিত ফসল যদি ১৮ মণ ৩০ কেজি হয়, তাহলে তাতে সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে ২০ ভাগের এক ভাগ এবং বিনা সেচে উৎপাদিত ফসলে ১০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত,



www.al-itisam.com

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি অথবা তলদেশের পানির কারণে এমনিতেই আর্দ্র, তাতে 'উশর' (উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ) দিতে হবে। আর যে ভূমি উষ্ট্রী, বালতি কিংবা সেচ যন্ত্র দিয়ে সিঞ্চন করা হয়, তার যাকাত হলো উশরের অর্ধেক' (অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ)। (আবূ দাঊদ, হা/১৫৯৬)।

## ইবাদাত- হজ্জ-উমরা

**প্রশ্ন (৩৩) : রামাযান মাসে উমরা পালন করলে নাকি রাসূল ﷺ-এর সাথে হজ্জ পালনের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। এটি কতটুকু সঠিক?**

-আবুল কাশেম

চাঁদপুর কাচারী, জামালপুর সদর, জামালপুর।

**উত্তর :** হ্যাঁ; উক্ত কথাটি সঠিক। রামাযান মাসে উমরা পালনকারী ব্যক্তি হজ্জের বা রাসূল ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার ছওয়াব পেয়ে থাকেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي 'রমাযান মাসে একটি উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান'। (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬; মিশকাত, হা/২৫০৯)।

## বৈধ-অবৈধ

**প্রশ্ন (৩৪) : মেয়ের নাম কানিজ ফাতিমা রাখা যাবে কি?**

-রবিউল ইসলাম

ফুলতলাহাট, বোদা, পঞ্চগড়।

**উত্তর :** كنيز 'কানিয' শব্দটিকে যদি ফারসী শব্দ ধরা হয়, তাহলে 'কানিয ফাতেমা' অর্থ 'দাসী ফাতেমা'। নামটিতে শিরক বিদ'আত না থাকলেও একটি পছন্দনীয় নাম হিসাবে গণ্য করা যায় না। অতএব শুধু ফাতেমা নাম রাখাই উত্তম। কেননা কারো নামের অর্থ সুন্দর না হলে রাসূল ﷺ তা পরিবর্তন করে দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ عاصية (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করে বললেন, তোমার নাম 'জামীলা' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩৯; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৫২)।

**প্রশ্ন (৩৫) : পরপর তিনটি সন্তান সিজারের মাধ্যমে হওয়ায় চতুর্থ সন্তান নিতে গিয়ে মায়ের জীবননাশের ঝুঁকি হতে পারে; এমন আশংকায় মায়ের নাড়ি কেটে নেওয়া কি জায়েয হবে?**

-আব্দুর রহমান

মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

**উত্তর :** না; এই পথ অবলম্বন করা যাবে না। কেননা এমনটি করা সন্তান হত্যার শামিল। মৃত্যুর সময় পূর্ব নির্ধারিত যা আগে-পরে হবে না। বাচ্চা প্রসবের সময় মৃত্যুবরণকারিণী নারীকে রাসূল ﷺ শহীদ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। জাবের ইবনু 'আতীক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত শহীদ ছাড়াও সাত ধরনের শাহীদ রয়েছে। ১. মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, ২. পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ৩. যা-তুল জাম্ব রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ৪. পেটের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ৫. অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ৬. কোনো প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৭. প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারিণী মহিলা' (নাসাঈ, হা/১৮৪৬; মিশকাত, হা/১৫৬১)।

**প্রশ্ন (৩৬) : বাবা খুবই কৃপণ। ক্ষেত-খামারের বিভিন্ন কাজে তাকে সহযোগিতা করলেও তিনি আমার প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা দিতে চান না। এমতাবস্থায় তার অজান্তে সামান্য পরিমাণ টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি?**

-সৌরভ

লালমণিরহাট।

**উত্তর :** বাবা আসলেই অত্যাধিক কৃপণ হলে তার অজান্তে 'প্রয়োজনীয়' টাকা নেওয়া যায়। তবে কোনোক্রমেই তা যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিংবা অসংগত খরচের জন্য না হয়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, হিন্দ বিনতে উতবা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান খুব কৃপণ মানুষ। আমার ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচ আমাকে দেয় না. তার অজান্তে কিছু নেওয়া ছাড়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমার ও তোমার সন্তানদের সংগতভাবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তুমি নিতে পার' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪)।

**প্রশ্ন (৩৭) : ফ্রান্সে আমার একটি রেস্টুরেন্টের লোগো (logo) তৈরির কাজে কি মুরগির ছবি ব্যবহার করা যাবে?**

-মুহাম্মাদ আশরাফ

ফ্রান্স প্রবাসী।

**উত্তর :** যাবে না। লোগো তৈরীতে বা যেকোনো ডিজাইনের কাজে প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা যাবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি আমার ছোট আলমারি আমার মূর্তির ছবিযুক্ত বড় রঙ্গিন চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলাম। তিনি যখন তা দেখতে পান, তখন তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিঁড়ে ফেললেন কিংবা টুকরা

টুকরা করে ফেললেন। এবং তাঁর চেহারা রঙ্গিন হয়ে যায় আর বলেন, আয়েশা! ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি শাস্তিযোগ্য হবে সে সকল লোক যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭; নাসাঈ, হা/৫৩৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪১২৭)। আবূ ত্বালহা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ফেরেশতারা ঐ গৃহে প্রবেশ করে না যাতে কুকুর এবং মূর্তির ছবি রয়েছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)। তবে প্রাণীর ছবি ব্যতীত ফুল বা কোনো প্রাকৃতিক ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রশ্ন (৩৮) : আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা। আমার স্বামী ছাড়া এই বিদ্যালয়ে আর কোনো পুরুষ শিক্ষক নেই। কিন্তু মাঝে মধ্যে 'উপজেলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'-এ মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকদের একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে সবার সামনে পাঠ উপস্থাপন করতে হয়। সেক্ষেত্রে পূর্ণ হিজাব পরিধান করে নারী-পুরুষ সকল শিক্ষকের সামনে পাঠ উপস্থাপন করা জায়েয হবে কি?**

-মোছাঃ রানুয়ারা

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

**উত্তর :** ইসলাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যতো গুরুত্বারোপ করেছে অন্য কোনো ধর্ম তা করেনি। তবে ইসলামী শিক্ষানীতিতে প্রচলিত সহশিক্ষানীতির কোনো স্থান নেই। বরং শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পৃথক পৃথক হতে হবে। সুতরাং পর পুরুষের সামনে পাঠ উপস্থাপন থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আর সম্ভব নাহলে এমন চাকুরি করা যাবে না। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার হাদীছ তো কেবল পুরুষরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তারা সমবেত হলো এবং নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩১০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬৮)। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, পুরুষ নারীর সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেঠ। তবে নারী পুরুষের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে না।

## পঠিতব্য দু'আ

**প্রশ্ন (৩৯) : কুরআন তেলাওয়াত কিংবা ওয়াজ-মাহফিল শেষে 'মজলিস শেষ করার দু'আ' পড়ার পক্ষে কোনো দলীল আছে কি? নাকি মজলিসে কোনো ভুলত্রুটি হলেই কেবল দু'আটি পড়তে হবে?**

-মাহফুজুর রহমান

হারাগাছ, রংপুর।

**উত্তর :** 'মজলিস শেষের দু'আটি সব ধরনের মজলিস শেষ করার পর পড়া উচিত। কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-মাহফিল, জুমু'আহর খুৎবা, বিচার-সালিশ, দৈনন্দিন ক্লাস, এমনকি ওযূ কিংবা ছালাতের শেষেও এই দু'আ পড়া ভালো। হাফেয ইবনু হাজার (আন-নুকাত ২/৭৩৩) এবং শায়খ আলবানী (সিলসিলা ছহীহা ৭/৪৯৫) গ্রন্থে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে ওযূ শেষে বলল (সুবহানাকা... শেষ পর্যন্ত) তার এই দু'আর উপর মোহর লাগিয়ে দিয়ে সেটা আরশের নিচে রেখে দেওয়া হয়, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ভাঙ্গে না' (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা, ইবনুস সুন্নী, পৃষ্ঠা ৩১, হা/৩০; আদ দাওয়াতুল কাবীর, ১/১১৮, হা/৫৯)। ইমাম হাকেম হাদীছটিকে মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন, হাফেয যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন (মুসতাদরাকে হাকেম, ১৯৭০)। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি কোনো মজলিসে বসে আর তাতে সে অধিক অনর্থক কথা-বার্তা বলে ফেলে। তবে মজলিস থেকে প্রস্থানের পূর্বে (সুবহানাকা... শেষ পর্যন্ত) এই দু'আ পাঠ করলে সেই মজলিসে তার যে ত্রুটি হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হবে' (তিরমিযী, হা/৩৪৩৩)। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ভালো কাজের শেষে ইসতিগফার করার শরীআতসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হলো আল্লাহর বাণী وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ 'আর যারা ভোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে' (আলে ইমরান, ৩/১৭) এর অর্থ হলো- রাত জেগে ছালাত আদায় করো। ছালাত শেষ হলে ভোরে ইসতিগফার করো। তাছাড়া হাদীছে এসেছে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত শেষে তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯১; মিশকাত, হা/৯৬১)। ... আল্লাহ আরো বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (আন-নাছর, ১১০/১-৩)। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসলে তাসবীহ ও ইসতিগফার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (মাজমূউল ফতওয়া, ১০/৮৯)। আল্লামা ইবনুল

কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকেরা আনুগত্যের কাজ শেষে অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করে। কারণ উক্ত কাজে তাদের ত্রুটি সম্পর্কে তারা জানে এবং এটাও জানে যে উক্ত কাজ আল্লাহর শান ও মানে যেমনটা হওয়া উচিত তেমনটা তারা করতে পারেনি।... তাছাড়া আল্লাহ হাজীদের সর্বোত্তম কর্ম 'আরাফার ময়দানে অবস্থান' শেষে ফিরে আসার পর ইসতিগফারের আদেশ দিয়েছেন। (মাদারিজুস সালেকীন, ১/৫২৪)। তাই সব ধরনের মজলিস শেষে উক্ত দু'আটি পড়া উচিত। -আল্লাহই ভালো জানেন।

**প্রশ্ন (৪০) : আমার ছেলের রাগ অনেক বেশি। এই রাগ দমনের জন্য তার কপালে হাত রেখে ২১ দিন ফজর ছালাতান্তে ২১ বার 'ইয়া হাসিবু' নামক তাসবীহ পাঠ করা যাবে কি?**

-নাসিরুদ্দীন
মন্ট্রিয়াল, কানাডা।

**উত্তর :** রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং রাগ হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে। তবে রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ফজরের ছালাতান্তে কপালে হাত রেখে ২১দিন ২১বার 'ইয়া-হাসীবু' নামক তাসবীহ পড়ার কোনো আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন আমল। আর যে আমল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় তা অবশ্যই বর্জণীয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (দ্বীনের মধ্যে) এমন কোনো আমল করলে, যার ব্যাপারে আমার কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়া সুন্নাত। সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। একবার নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দুইজন ব্যক্তি একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। আমরাও তার কাছেই বসাছিলাম, তাদের একজন অপরজনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল যে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তা হলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়ত (ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১০)। সুতরাং এমতাবস্থায় বেশি বেশি উক্ত দু'আটি পড়তে পারে। এমন সন্তানের জন্য মাতা-পিতার উচিত আল্লাহর নিকট সন্তানের রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ চাইলে মাতা-পিতার দু'আর বিনিময়ে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন (৪১) : হালাল রিযিকের জন্য কি কি দু'আ পড়া যায়?**

-রাহাত
মিরপুর, ঢাকা।

**উত্তর :** হালাল রিযিকের জন্য নিম্নোক্ত দু'আগুলো পড়া যেতে পারে- ১. اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ তথা; হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হতে মুখাপেক্ষীহীন করুন (তিরমিযী, হা/৩৯১১; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৬)। ২. اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا مِنْ فَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ তথা 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আপনার হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে মুক্ত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের অন্যদের হতে মুখাপেক্ষীহীন করুন' (জামেউল আহাদীছ, হা/২৭৪২৩)। ৩. اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً তথা 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, পবিত্র রিযিক্ব এবং গ্রহণীয় কর্ম কামনা করি (ইবনু মাজাহ, ৯২৫; মিশকাত, হা/২৪৯৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫১১)। এছাড়াও নিজ ভাষায় আল্লাহর নিকট রিযিক্বের জন্য দু'আ করা যায়।

## ইবাদাত- দু'আ

**প্রশ্ন (৪২) : 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দুরূদ পাঠ না করে দু'আ করলে সেই দু'আ নাকি আসমানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং তা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছায় না'। কথাটি কি ঠিক? দু'আ করার সঠিক পদ্ধতি কী?**

-আব্দুল বাতেন
কোতোয়ালি, রংপুর।

**উত্তর :** হ্যাঁ; দু'আ করার পূর্বে দুরূদ না পড়া হলে বান্দার দু'আ আসমানে ঝুলন্ত থাকে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ (তিরমিযী, হা/৪৮৬)। দু'আ করার সঠিক পদ্ধতি হলো- ১. পাপ কাজ ছেড়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে দু'আ করা, ২. একনিষ্ঠতার সাথে দু'আ করা, ৩. আল্লাহর গুণবাচক নামের মাধ্যমে দু'আ করা, ৪. দু'আর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা, ৫. রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দুরূদ পড়া, ৬. কিবলামুখী হওয়া, ৭. হাত উত্তোলন করা, ৮. হাতের অভ্যন্তরীণ অংশ আকাশের দিকে হওয়া, ৯. দু'আ কবুলের বিশ্বাস রাখা, ১০. আল্লাহর কাছে বেশি করে চাওয়া, ১১. দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, ১২. ভয় ও বিনয়ের সাথে দু'আ করা, ১৩. হালাল খাওয়া ও পরিধান করা ও ১৪. দু'আ নিম্নস্বরে করা। উক্ত নিয়মগুলো কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (আল-আ'রাফ, ১৮০)।

## জানাযা-মৃত্যু- দু'আ- অছিয়ত

**প্রশ্ন : (৪৩) গায়রে মাহরাম আত্মীয় মারা গেলে সেই বাড়িতে মহিলাদের যাওয়া যাবে কি?**

-শারমিন
মহিষখোলা, নড়াইল সদর, নড়াইল।

উত্তর : যাওয়া যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭০০)। তবে বিশেষ প্রয়োজনে পর্দার সাথে যেতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/১২৫৪; মিশকাত, হা/১৬৩৪)।

**প্রশ্ন : (৪৪) জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় মসজিদের জন্য ৫ বিঘা জমি দেওয়ার অসিয়ত করে যায় এবং শর্ত করে যায় যে, এই ৫ বিঘা জমির দায়িত্বে থাকবে তার সন্তানরা। এই শর্ত মসজিদ কমিটি মানতে না চাইলে ঐ জমি অন্য মসজিদে দেওয়া যাবে কী?**

-ইমরান হুসাইন
গোপালগঞ্জ সদর।

উত্তর : জমিদাতা যেভাবে অছিয়ত করেছেন সেভাবেই অছিয়ত পূরণ করতে হবে। অতএব, শর্তানুসারে মসজিদ কমিটি জমি গ্রহণ না করলে জমি অন্য মসজিদে দেওয়া যাবে। কেননা মসজিদের সম্পদ মসজিদেই খরচ করতে হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, উমার খায়বার যুদ্ধে (গনীমাতের) একখণ্ড জমি পেলেন। অতঃপর তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি খায়বারে একখণ্ড জমি পেয়েছি, তার চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এখন আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি চাও তবে এর মূলস্বত্ব রক্ষা করে লভ্যাংশ দান করে দিতে পার। তাই উমার মূলস্বত্ব রেখে দান করলেন যে, তার মূল বিক্রি করা যাবে না, হেবা (দান) করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৭)।

**প্রশ্ন (৪৫) : শুনেছি যে, 'কোনো মুসলিমের জানাযার ছালাতে যদি একশজন মুসলিম অংশগ্রহণ করে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে'। তাই জানাযায় অধিক মুসলিমের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মৃত্যু সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?**

-মোজাম্মেল হক
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

**উত্তর :** কারো জানাযায় একশতজন লোক শরীক হয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় (নাসাঈ, হা/১৯৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৬৭৮৪)। ছহীহ মুসলিমের ৯৪৮ নং হাদীছে ৪০ জনের কথা এসেছে। উক্ত ফযীলত থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের কাউকে মৃত্যু সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে দেখা যায়নি। বরং জানাযার ছালাতের পূর্ব মুহূর্তে ৪০ জনের মতো লোক উপস্থিত হয়েছে কি না, এটা জানার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ৪০ জন লোক উপস্থিত হলেই সেটাকে তারা যথেষ্ট মনে করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর এক ছেলে কুদায়দ বা উসফান নামক স্থানে মারা গেলে তিনি খাদেম কুরায়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, দেখো তো কতজন লোক একত্রিত হয়েছে। কুরায়ব বলেন, আমি বের হয়ে দেখলাম কিছু লোক এসেছে। আমি তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, ৪০ জন হবে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে জানাযা বের করো। কারণ আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলছে শুনেছি, 'কোনো মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযায় যদি এমন ৪০ জন লোক শরীক হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোনো শিরক করেনি, তাহলে ঐ মায়্যেতের ব্যাপারে আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৪৮)। অতএব, অধিক লোকের উপস্থিতির আশায় মৃত্যু সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে না। বরং মানুষের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে পারে।

## কুরআন-তাফসীর

**প্রশ্ন (৪৬) : সূরা নিসার ১৫ নং আয়াত ও সূরা নূরের ২ নং আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্ব পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা ও সমাধান কী?**

-আব্দুর রহমান সৈকত
রামনগর, রায়পুরা, নরসিংদী।

**উত্তর :** আয়াতদ্বয়ের মাঝে কোনো বৈপরিত্ব নেই। সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতে যেনাকারিণী নারী ও পুরুষকে আমৃত্যু গৃহবন্দী করে রাখার আদেশ প্রদান করা হয়েছে' যা অস্থায়ী বিধান ছিল। কেননা মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতের শেষে বলে রেখেছেন, أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا 'অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা (বিধান) করে দেন'। পক্ষান্তরে, সূরা নূরের ২নং আয়াতে অবিবাহিত যেনাকারী নারী-পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা পরবর্তী বিধান। ইসলামের একটি মূলনীতি হলো পরবর্তী বিধান পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করে দেয়। সুতরাং সূরা নিসার ১৫নং আয়াতে 'আমৃত্যু গৃহবন্দীর বিধান সূরা নূরের ২নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করেছেন। যদি কোনো অবিবাহিত পুরুষ কোনো কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে একশত বেত্রাঘাত করো এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোনো বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশত বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০)।

## জ্ঞান অর্জন

**প্রশ্ন : (৪৭) আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জেনারেল সাবজেক্ট-এ পড়াশোনা করি। তবে বর্তমানে আমি দ্বীনি ইলম অর্জন করতে চাই। কিন্তু এতে বাবা-মা অসন্তুষ্ট। আমি কি তাদের অসম্মতিতে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারি?**

-মুহাম্মাদ আলী নাঈম
মান্দা, নওগাঁ

**উত্তর :** দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এই মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। (ছহীহ ইবনু খুজায়মা, হা/২২৪; ছহীহুল জামে’, হা/৩৯১৩ ‘হাদীছ ছহীহ’)। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপাপ। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ‘কবীরা গুনাহসমূহ হলো- আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৭৫; মিশকাত, হা/৫০)। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছেন (আল-ইসরা, ২৩)। অতএব, জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। জ্ঞান অর্জনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা ভালো। তবে কেবল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা যায় এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং জ্ঞান অর্জনের অনেক পথ ও পন্থা রয়েছে। যেমন ইসলামী বই-পুস্তক বেশি বেশি অধ্যায়ন করা, নিজে লাইব্রেরি স্থাপন করা, অনলাইন বা অফলাইন সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী আলেমদের দারস (ক্লাস) গ্রহণ করা, সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী আলেমদের বক্তব্য শ্রবণ করা, প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান বিজ্ঞ মুফতিদের নিকট জেনে নেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং পিতা-মাতাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করার পরেও বোঝাতে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত পথগুলো অনুসরন করে জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে। তবুও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না।

## বিবিধ

**প্রশ্ন : (৪৮) কোন দলীলের ভিত্তিতে হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ‘সাইয়্যিদুশ-শুহাদা’ বলা হয়ে থাকে?**

-নাঈম রহমান
সিদ্ধেশ্বরী, মৌচাক, ঢাকা।

**উত্তর :** স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সাইয়্যেদুশ শুহাদা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদুশ শুহাদা (শহীদদের সর্দার) হবেন’ (মুস্তাদরাক হাকেম, হা/২৫৫৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৭৪)।

**প্রশ্ন (৪৯) : নারী-পুরুষের সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য কী?**

-হিলালুদ্দীন
উখিয়া, কক্সবাজার।

**উত্তর :** পুরুষের সুগন্ধি হলো ঘ্রাণ ছড়াবে কিন্তু রঙ গোপন থাকবে। আর নারীর সুগন্ধি হলো রঙ প্রকাশ পাবে কিন্তু ঘ্রাণ ছড়াবে না/গোপন থাকবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘পুরুষের সুগন্ধি হলো যার ঘ্রাণ ছড়ায় কিন্তু রঙ প্রকাশ পায় না। আর মহিলার সুগন্ধি হলো যার রঙ প্রকাশ পায় কিন্তু ঘ্রাণ গোপন থাকে/ছড়ায় না’ (তিরমিযী, হা/২৭৮৭; নাসাঈ, হা/৫১১৭; মিশকাত, হা/৪৪৪৩)। মহিলাদের পরপুরুষের সামনে পর্দা করে চলা যেমন জরুরি তেমনি তাদের সামনে ঘ্রাণ প্রকাশ না করা জরুরি। বেপর্দা হয়ে চললে যেমন যেনা হয় তেমনি আতর, পারফিউম বা যেকোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে পরপুরুষের সামনে গেলে যেনা হয়। আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মহিলা যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো লোকদের সামনে দিয়ে যায় যাতে তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পায়, তাহলে সে যেনাকারিণী মহিলা’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৬২; নাসাঈ, হা/৫১২৬; আত-তারগীব, হা/২০১৯)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মহিলা যদি মসজিদে যেতে চায়, তাহলে সে যেন সুগন্ধি থেকে সেভাবে গোসল করে নেয় যেভাবে সে নাপাকির গোসল করে থাকে’ (নাসাঈ, হা/৫১২৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/১০১৩)। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, মহিলারা নারীসমাজে বা বাড়িতে স্বামীর সামনে যেমন খুশি তেমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। আর স্বামী সঙ্গে থাকলেও সুগন্ধি ব্যবহার করে পরপুরুষের সামনে বাড়ির বাহিরে, রাস্তা-ঘাটে, দোকান-পাটে বা মার্কেটে যেতে পারবে না।

**প্রশ্ন (৫০) : ‘যে ব্যক্তি মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, প্রত্যেক মুসলিমের পরিবর্তে একটি করে ছওয়াব মহান আল্লাহ তার আমলনামায় লিখে দেন’ (তাবারানী, ৩/২৩৪ পৃ.)। হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানাবেন।**

-রাজীব রেজা
গোবিন্দপুর, নেত্রকোনা।

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীছটিকে ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন (ছহীহুল জামে‘, হা/৬০২৬)।



www.al-itisam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

# নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

## কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

### আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

**Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund**
**Account No: 20501130204367701**

**Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund**
**Account No: 20501130204367417**

### মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

**Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund**
**Account No: 20501130204367316**

### দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

**Account Name: Al Itisam Dawah Fund**
**Account No: 20501130204367802**

### ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

**Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund**
**Account No: 20501130204367903**

### দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

**Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund**
**Account No: 20501130204367600**

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ | বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ ; ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

**নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন**





Monthly Al-Itisam الاعتصام 6th Year, 1st Part, November 2021, Price : 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

# সালাফী কনফারেন্স

## সভাপতি

## আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী।

**সময়সূচি**

**৬ষ্ঠ বার্ষিক ২০২২**
**১৩ ও ১৪ জানুয়ারি, ২০২২**
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাবো, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

**৬ষ্ঠ বার্ষিক ২০২১**
**২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১**
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

বক্তব্য পেশ করবেন :
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

ব্যবস্থাপনায় : আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
আয়োজনে : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ
মিডিয়া পার্টনার : Al-Itisam TV, মাসিক আল-ইতিছাম, LIVE YouTube Al-Itisam TV